কালকূট

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫১

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়—১৩৫৭

তৃতীয় মুদ্রণ—কার্ত্তিক, ১৩৬৫

টিকটিকির ডিম

শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম, যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইন বিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশঃ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম।

পৃথ্বী বলিল, যাই বল, গান্ধীটুপী পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপী পরিহিত চূণী বলিল, হওয়া যায়! বাংলাদেশের সাত-কোটি লোক যদি গান্ধীটুপী পরে তা হ'লে অন্ততঃ এককোটি গজ খদ্দর বিক্রী হয়, তার দাম নিদেন পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ঐ টাকাটা দেশের লোকের পেটে যায়।

পৃথ্বী বলিল, হতে পারে। কিন্তু টুপী পরলে বাঙালীর বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা সে যে-টুপীই হোক। 'ন্যাংগা শির' হচ্চে বাঙালীর বিশেষত্ব!

চূণী চটিয়া উঠিয়া বলিল, কেবল ওই বিশেষত্বের জোরে যদি বাঙালী বেঁচে থাকতে চায়, তা হ'লে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত!

দূরে টেবিলের এক কোণে বরদা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করিল, টিক্‌টিকিকে হাসতে দেখেছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেল; তারপর সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বরদা বলিল, হাসির কথা নয়। মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে; সেটা কিন্তু নিন্দুকের অখ্যাতি। স্রেফ্‌ গান্ধীটুপী পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সদ্য সদ্য প্রমাণ যদি চাও ত আমি দিতে পারি।

সকলেই বুঝিল একটা গল্প আসন্ন হইয়াছে। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার গাঁজার শ্রাদ্ধ হবে, আমি বাড়ী চললুম—। দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখ, তোমরা ভাল চাও ত বরদাকে ক্লাব থেকে তাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মত শূন্যে উড়ে যাবে, বলিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যীশুকে ত ক্রুশে চড়তে হয়েছিল। যাক্‌, হৃষী, একটা সিগার দাও ত।

হৃষী বলিল, সিগার নেই। বিড়ি খাও ত দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার পকেটে—

নিজের পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া সযত্নে ধরাইয়া বরদা বলিতে আরম্ভ করিল, ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সংকোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি। দেখ, শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়, পশুপক্ষী এমন কি

কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই ত সেদিনের কথা, বড় জোর বছর-দুই হবে।

ছুটির সময় কাজের তাড়া নেই, তাই নিশ্চিন্ত মনে গী-দ্য মোপাসাঁর গল্পগুলো আর একবার পড়ে নিচ্চি। আমাদের দেশে অকালপক্ক তরুণ সাহিত্যিকেরা দ্য-মোপাসাঁর দোষটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তাঁর গুণের কড়াক্রান্তিও পান নি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।

সে যাক্। সে-রাত্রে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরাসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কখন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচ্চে। টিকটিকিটার স্পর্দ্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সব চেয়ে টিকটিকি বীভৎস। মাকড়শা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমন কি ব্যাং পর্য্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকটিকি! জানো, টিকটিকির এক কানের ভেতর দিয়ে আর এক কান পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়? তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনা-আপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিকটিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া সিড় সিড় করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয়; ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের বেরাল দেখলে ঐ রকম হ'ত।*

---

* বরদা ভুল করিয়াছে, ডিউক অফ ওয়েলিংটন নয়—লর্ড রবার্টস্।

যা হোক, টিক্‌টিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক্‌ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলুম যে টিক্‌টিকিকে হাস্‌তে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেরালের হাসি, শিম্পাঞ্জীর হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিক্‌টিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্য্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না।

এই টিক্‌টিকিটার মুখে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল: তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি। সে হাসির অর্থ—দেখেই ত চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না?

বড় রাগ হ'ল। একটা টিক্‌টিকি—হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা, আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান, বোধহয় সেটা ওয়েব্‌ষ্টারের, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোণায় দমাস্‌ করে এক-ঘা বসিয়ে দিলুম। টিক্‌টিকিটা বিদ্যুতের মত ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল, প্রায় দু'মিনিট! তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করে হাসি।

আমার গিন্নী পর্দ্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দ-ভেদী যুদ্ধ দেখ্‌ছিলেন, চুড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন। টিক্‌টিকি সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বলতা তিনি আগে থেকেই জান্‌তেন।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অভিধানখানা হাতেই ছিল, দু'হাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিক্‌টিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে!

হুলস্থূল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উল্টে গিয়ে ডোম-চিম্‌নি ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোট ভাই পাঁচুর হিন্দুস্থানী মাষ্টার বাইরের ঘরে বসে পড়াচ্ছিল, 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে চেঁচাতে লাগল।

আমি চীৎকার করে ডাকলুম, রঘুয়া, জল্‌দি একঠো লণ্ঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে টিক্‌টিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে!

রঘুয়া উর্দ্ধশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হ'ল। তখন দেখা গেল, ভাঙা কাঁচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিক্‌টিকির মুণ্ডটি কেবল বেরিয়ে আছে, ধড়াটা পিষে ছাতু হয়ে গেছে। মুণ্ডটা একেবারে অক্ষত, যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে!

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দু-চার বার শিউরে শিউরে উঠল। বীভৎস মৃত দেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ভাত খাবার রুচি হ'ল না।

সমস্ত রাত্রি ঘুমের মধ্যে কতকগুলো দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলুম তখন শরীর মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব।

বিরস মনে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, দুটি ছোট ছোট ডিম পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক খড়ি-মাখানো করম্‌চার মত। ইতিপূর্ব্বে টিক্‌টিকির ডিম কখনো দেখি নি কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে এ দুটি সেই বস্তু।

হাঁকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করলুম, কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না, এমন কি প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তখন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হ'ল। পেঁচোকে নিয়ে পড়লুম, সে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেল্লে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। শাস্তি-স্বরূপ তাকে ডিম দুটো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলুম।

এ-যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি-দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে শাদা শাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোঁকা লাগল। তাই ত! এখানে ডিম কে রাখে?

তারপর দেখতে দেখতে বাড়ীময় যেন টিক্‌টিকির ডিমের হরির লুঠ পড়ে গেল। যেদিকে তাকাই, যেখানে হাত দিই, সেইখানেই দুটি করে ডিম। হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী-টিক্‌টিকি সবাই সংকল্প করে আমার চারিপাশে ডিম পাড়তে সুরু করে দিয়েছে।

এম্‌নি ব্যাপার দু'দিন ধরে চলল। মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্য্যন্ত ভয় করতে লাগল, পাছে সেখান থেকে টিক্‌টিকির ডিম বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিৎকর যে মনের কথা কাউকে খোলসা করে বলাও যায় না। টিক্‌টিকির ডিম দেখেছে তার আর হয়েছে কি? এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। আমিও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হ'ল না। বরঞ্চ সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে এ ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, কোথাও এর একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিক্‌টিকিকে অপঘাত মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ-বুদ্ধিতে একথাও মেনে নেওয়া যায় না। তবে কি এ? অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলুম, সম্ভবতঃ যে টিক্‌টিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলি ডিম পেড়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়ীতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম—যাই ক্লাবে। ছুটির সময়, তোমরা কেউ এখানে ছিলে না; ক্লাব একরকম বন্ধ; তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের উপর পাৎলা একপুরু ধুলো পড়েছে; অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইএর কাটিটা অ্যাশ্‌ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি, ছাই পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দুটি ডিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ী চলে এলুম!

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ রে, কদিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি—শরীর কি ভাল নেই?

আমি বললুম, হ্যাঁ—ঐ একরকম, বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই। টিক্‌টিকি-বধূর অতি-প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত, ডিমভূত! সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ টিক্‌টিকিটা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; এবং ঐ ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।

ইতর প্রাণীর ওপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ

বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, তা হ'লে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভীপাক নরক অনিবার্য্য। আসল কথা, আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অনুতপ্ত হয়ে সেই দংষ্ট্রাবহুল গতাসু টিক্‌টিকিকে উদ্দেশ করে কেবলি বলছিলুম, হে প্রেত! হে নিরলম্ব বায়ুভূত! যথেষ্ট হয়েছে, এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর!

কিন্তু সম্বরণ করে কে? রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে দুটি সুসিদ্ধ ডিম্ব! কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন, কি হ'ল, উঠলি যে?

শরীরের প্রবল কম্পন দমন করে বললুম, ক্ষিদে নেই—

বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলুম মা বধূকে তিরস্কার করচেন, বোকা মেয়ে, করম্‌চা কখনো ভাতে দিতে আছে! ওর যা ঘেন্নাটে স্বভাব, দেখেই হয় ত না খেয়ে উঠে গেল।

রাত্রে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখলুম। অপূর্ব্ব এই হিসাবে যে তার পূর্ব্বে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি, এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই।

স্বপ্ন দেখলুম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবা-মাত্র বুঝতে পারলুম যে, বিছানায় চাদর পাতা নেই—তার বদলে আগাগোড়া টিক্‌টিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মত লক্ষ লক্ষ টিক্‌টিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না। সেইখানে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই ধেড়ে টিক্‌টিকিটা —যাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম—আমার ঘাড় বেয়ে নাকের উপর উঠে বসে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

গিন্নীর ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলুম, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং তখনো যেন টিকটিকির বীভৎস ছানাগুলো গা-ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

ভাই, অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছি এবং আরো অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

* * * *

ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি করব, কোথা যাব—যেন কোন দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। শরদিন্দু গয়া থেকে লিখেছে; চিঠি এমন কিছু নয়, 'তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি' গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হ'ল এ চিঠি নয়—দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ শরদিন্দুকে 'তার' করে দিলুম। আজই যাচ্ছি।

তারপর যথাকালে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদ্গতি সংকল্প করে পিণ্ডি দিলুম। গয়াতে আজ পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না কিন্তু সেই থেকে আমার ওপর আর কোনো উপদ্রব হয় নি।

সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন!

কালকূট

ওই যে উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েটি তোমাদের হাসি-গল্পের আসর ছাড়িয়া হঠাৎ আড়ষ্টভাবে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, শ্রীমতী পাঠিকা, তোমরা উহাকে চেন কি? কেন চিনিবে না? ও ত প্রফেসর হীরেন বাগচির স্ত্রী। গত পাঁচ বছর ধরিয়া তোমরা নিত্য উহার সঙ্গে মেলামেশা করিতেছ। ওর নাম কমলা, ওর একটি চার বছরের মেয়ে আছে, ওর বাপের বাড়ি চন্দননগরে, সবই ত তোমরা জান। কেন চিনিবে না?

কিন্তু তবু তোমরা কেহ উহাকে চেন না। ওর মনের সামনে একটা পর্দা পড়িয়া আছে; ওর সুন্দর টুলটুলে মুখখানিতে, ওর পরিপূর্ণ নিটোল দেহটিতে নারী-সৌন্দর্য্যের সব উপকরণই আছে, শুধু ভিতরকার মানুষটির পরিচয় নাই। পাঁচ বছরের ঘনিষ্ঠ মেলামেশাতেও তোমরা উহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পার নাই; এই ত সেদিন তোমাদের মধ্যেই কথা হইতেছিল, একজন বলিয়াছিল, দেখ ভাই, কমলা যেন কেমন-ধারা। এই বেশ হেসে কথা কইছে, আবার এখনই কি রকম গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপরেই উঠে চ'লে যায়। ওর মনের কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানতে পেরেছিস?

আর একজন বলিয়াছিল, আমরা সবাই ওর কাছে বরের গল্প ক'রে মরি, আর ও কেমন মুখ টিপে ব'সে থাকে দেখেছিস?

তৃতীয়া বলিয়াছিল, সেদিন দেখলি ত, প্রীতির বিয়ের গল্প শুনে যেন পাষাণ-মূর্ত্তি হয়ে গেল। আচ্ছা, প্রীতি আর তার বরের বিয়ের

আগে থাকতে ভালবাসা হয়েছিল, তারপর দু'জনের বিয়ে হ'ল, এতে ভয়ে সিটিয়ে যাবার কি আছে ভাই ?

তা নয়, স্বামীর কথা উঠলেই ওই রকম হয়ে যায়. তারপর একটা ছুতো ক'রে উঠে পালায়।

যা বলিস ভাই, আমার ত মনে হয়, ওর বর ওকে ভালবাসে না।

দূর ! সে হ'লে মুখ দেখেই বোঝা যেত।

তা নয়। আসল কথা, প্রফেসরের গিন্নী, তাই আমাদের মত মুখ্যুর সঙ্গে মন খুলে কথা কইতে লজ্জা করে।

ও কথা বলিস না। কমলার শরীরে এক ফোঁটা অহঙ্কার নেই, একেবারে মাটির মানুষ. কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে।

এই সকল আলোচনা যখন হয়, তখন একটি মেয়ে কোন কথা বলে না, হেঁট হইয়া ক্রুসে লেস তৈয়ার করে। কে জানে হয় ত সে কমলার ব্যথায় ব্যথী নিজের অন্তরের নিগূঢ় বেদনার দ্বারা অপরের মর্ম্মের ইতিহাস বুঝিতে পারে।

কিন্তু মোটের উপর কেহই যে কমলার চরিত্র বুঝিতে পারে নাই, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বেশি কথা কি, তাহার স্বামী যে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়াছে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না! অথচ হীরেন তাহাকে ভালবাসে, এত বেশি ভালবাসে যে, এক এক সময়ে সে ভালবাসা বাহিরের লোকের চোখে উৎকট ঠেকে। তাহাদের এই ছয় বছরের দাম্পত্যজীবনে এমন একটা কলহও ঘটে নাই, যাহাকে অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের সহিত শ্রেণীভুক্ত করিয়াও উপহাস করা যাইতে পারে।

অন্য পক্ষে, কমলা তাহার স্বামীকে ভালবাসে না, হয় ত বিবাহের

পূর্ব্বে সে আর কাহাকেও ভালবাসিত—এমন একটা সন্দেহ অজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সন্দেহ একেবারেই অলীক। স্বামীকে ভালবাসে না, সাধারণ বাঙালীর মেয়ের পক্ষে এত বড় অপবাদ বোধ করি আর নাই। কমলাকে কিন্তু সে অপবাদ কেহ দিতে পারিত না। সে নিজের স্বামীকে ভালবাসিত মনের প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়া, শরীরের সমস্ত স্নায়ু শিরা রক্ত দিয়া। কিন্তু তবু এত ভালবাসা সত্ত্বেও, হয় ত বা এত ভালবাসার জন্যই, সময়ে সময়ে দুইজনের মাঝখানে অপরিচয়ের পর্দ্দা নামিয়া আসিত; কমলা মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বিজনে একাকী বসিয়া থাকিত, তখন হীরেন কোনমতেই তাহার নাগাল পাইত না।

কাবার্ডের মধ্যে কঙ্কাল বলিয়া ইংরাজীতে একটা কথা আছে। সেই কথাটার ভাল তর্জ্জমা যদি বাংলায় থাকিত, তাহা হইলে কমলার জীবনের ইতিহাস এক কথায় বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। কারণ, ওই কঙ্কালটা যখন খট খট শব্দে নড়িয়া উঠিত, তখনই ভীত বিহ্বল কমলা ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত, তারপর কঙ্কালের সংগে নিজেকে বন্দিনী করিয়া অশ্রুহীন শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া নরকের দুঃস্বপ্ন দেখিত।

আসল কথা, শিশু যেমন অবহেলায় খেলাচ্ছলে বহুমূল্য দলিল ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া ফেলে, কমলাও একদিন তেমনই খেলাচ্ছলে নিজের ইহকাল পরকাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; তাই আজ বাহিরের সংসার যতই ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিতেছে, মনের কঙ্কাল ততই তাহার পিছনে প্রেতের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নারীদেহ যে পবিত্র, তাহার শুচিতা নষ্ট করিবার অধিকার যে তাহার নিজেরও নাই, এ ধারণা নারীর মনে কত বয়সে উদয় হয়? শৈশবে শুচিতা অশুচিতা কোনও জ্ঞানই থাকে না, কৈশোরে কিছু কিছু দেখা দেয়, পরিণত যৌবনে ইহা পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পায়। তাই বুঝি

যৌবনে নারী নিজ দেহকে অন্যের দৃষ্টি হইতেও রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা লজ্জায় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলিতে শুনিয়াছি যে, মনের অগোচরে পাপ নাই ; অর্থাৎ অপরাধ করিতেছি—এ জ্ঞান না থাকিলে অপরাধ হয় না। কথাটা কি সত্য ? তাই যদি হয়, তবে অজ্ঞানকৃত দোষের জন্য আমরা লজ্জিত হই কেন ? আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় একটা ইঁদুরছানা ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীরটিকে অশেষভাবে নির্য্যাতিত করিয়া শেষে ভাঙা কাঁচ দিয়া পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া তাহার গলা কাটিয়াছিলাম। সেই দুষ্কৃতির স্মৃতি এখনও আমাকে পীড়া দেয় কেন ?

তেরো বৎসর বয়সে কমলা একটা অপরাধ করিয়াছিল। তখনও তাহার দেহের শুচিতাবোধ জন্মে নাই। কিন্তু কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। যাঁহারা কদাচিৎ সত্য কথা শুনিতে ভয় পান, তাঁহারা কানে আঙুল দিতে পারেন।

ডাক্তারী বইয়ে হয় ত এক-আধটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণত তেরো বছর বয়সে মেয়েদের যৌনক্ষুধা জাগ্রত হয় না। যাহা জাগ্রত হয়, তাহা যৌন-কৌতূহল। এই কৌতূহল প্রকৃতিদত্ত এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহারই অদম্য তাড়নায় কত কচি প্রাণ অঙ্কুরে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কে গুণিয়া দেখিয়াছে ? এই কৌতূহলকে উত্তেজিত করিবার কারণেরও অভাব নাই। নিজের দৈহিক বিবর্ত্তনই সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করিয়া তুলে। বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করিয়া পরিবর্ত্তনশীল শরীরই সর্ব্বপ্রথম বিপ্লব বাধায়। অথচ ট্রাজেডি এই যে, দেহটাই গোড়ায় এই বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করে।

কমলা তেরো বছরের অর্দ্ধস্ফুট দেহে অনাগত সুখ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত

পাইত, অজ্ঞাতকে জানিবার সদা-জাগ্রত কৌতূহল অনুভব করিত ; কিন্তু সত্যকার দৈহিক সুখ-লালসা তখনও তাহাকে অধীর করিয়া তুলে নাই। দূরাগত বনমর্ম্মরের মত সে আসন্ন যৌবনের চরণধ্বনি শুনিয়া উচ্চকিত হইয়া থাকিত, কিন্তু সে চরণধ্বনি আর নিকটে আসিত না। কমলার কৌতূহল তাহাতে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিত।

কমলার দিদির বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সে লুকাইয়া বরকে চিঠি লিখিত, কমলাকে দেখিতে দিত না। জামাইবাবু যখন আসিতেন, তখন দিদির সকৌতুক প্রেমলীলার দৃশ্যমান অংশটুকু কমলা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আত্মসাৎ করিত। কিন্তু তবু তৃপ্তি পাইত না। অনেকখানিই যেন বাকি থাকিয়া যাইত। শরীরের মধ্যে সে একটা উত্তপ্ত অস্থিরতা অনুভব করিত। অপ্রাপ্তির ক্লেশ তাহাকে চঞ্চল অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত।

এইরূপ সংকটপূর্ণ যখন তাহার অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একটি লোক। লোকটিকে কমলা যে এতদিন দেখে নাই তাহা নয়, প্রত্যহ দুইবেলা দেখিয়াছে। কিন্তু সে যে তাহার দিদির বর জামাইবাবুর স্বজাতি অর্থাৎ পুরুষমানুষ, এবং যে কৌতূহল অহরহ তাহাকে দগ্ধ করিতেছে তাহা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যে ইহার আছে, এই সম্ভাবনার দিক দিয়া এতদিন সে তাহাকে দেখে নাই। হঠাৎ জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান-স্বরূপ এই ছোকরাকে দেখিয়া কমলার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

ছোকরার বয়স বোধ করি কুড়ি-একুশ ; দেখিতে এমন কিছু নয় যে, দেখিবামাত্র কেহ মজিয়া যাইবে! রোগা চেহারা, গাল বসা, চোখের কোলে কালি, কিন্তু চুলের খুব বাহার। তাহার নাম প্রভাস—পাড়ারই কোন ভদ্রলোকের ছেলে। ছেলেবেলা হইতেই তাহার এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল এবং বড় হইবার পরও যাতায়াত অব্যাহত

রহিয়া গিয়াছিল। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাও বাড়ির লোকের সহিয়া গিয়াছিল, কেহ আপত্তি করিত না।

সে সময়ে-অসময়ে বাড়িতে ঢুকিত এবং কমলাকে একলা পাইলেই তাহার খোঁপা খুলিয়া দিত, কাপড় ধরিয়া টানিত, কখনও বা গাল টিপিয়া দিত। এক এক সময় সুবিধা পাইলে গলা খাটো করিয়া এমন দুই-একটা কথা বলিত যাহার ইঙ্গিত কমলা বুঝিত না, কিন্তু বুঝিয়াছে— এমনই ভান করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কমলার তখনও শরীরের শুচিতাজ্ঞান জন্মে নাই, শুধু জীবনের অজ্ঞাত রহস্য জানিবার অদম্য লিপ্সা ছিল।

কিন্তু সহসা যেদিন প্রভাস কমলার চক্ষে সমস্যার মীমাংসারূপে দেখা দিল, সেদিন হইতে কমলা সর্ব্বদা তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। তাহার স্পর্শ ও কথা কিসের ইঙ্গিত করিয়া গেল, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় গোপনে মনের মধ্যে সর্ব্বদা আলোচনা করিত। চুম্বকের সামীপ্যে যেমন লোহার চৌম্বক আবেশ হয়, প্রভাসের সংস্পর্শও তেমনই তাহাকে তত্ত্বাবিত করিয়া তুলিত।

একদিন দুপুরবেলা, বাড়িতে কেহ কোথাও ছিল না—মা পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দিদি উপরের ঘরে দোর বন্ধ করিয়া বরকে চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময় পা টিপিয়া টিপিয়া প্রভাস ঘরে ঢুকিল। কমলা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, প্রভাস পিছন হইতে হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কমলার ঘাড়ের উপর তাহার উষ্ণ নিশ্বাস পড়িয়া কমলার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে অকারণে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ছাড়। ও কি করছ?

প্রভাস তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, চুপ। আস্তে। কমলি, একটা ভারি মজা দেখবি? খিড়কিপুকুরের ওপারে

প'ড়ো ঘরটাতে সব ঠিক ক'রে রেখেছি, তুই কিছুক্ষণ পরে সেখানে যাস। চুপিচুপি যাস, কাউকে বলিস নি। আমিও সেখানে থাকব।

কমলার বুক ভয়ানক ধড় ফড় করিতে লাগিল, সে রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা।

প্রভাস যেমন আসিয়াছিল তেমনই চোরের মত বাহির হইয়া গেল।

এমনই করিয়া শিশু যেমন অজ্ঞানে খেলাচ্ছলে মহামূল্য দলিল ছিঁড়িয়া ফেলে, কমলা তেমনই করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সুখশান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল!

কিন্তু অমূল্য বস্তু খোয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ ক্ষতির জ্ঞান জন্মে না। কমলারও সে বোধ জন্মিতে দেরি হইল। মাস-দুই এই ভাবে চলিবার পর আর একটা ঘটনা ঘটিয়া তাহার নিমীলিত চেতনাকে বিস্ফারিত করিয়া খুলিয়া দিল।

সেদিন কমলার মা কমলাকে সংগে লইয়াই পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বেলা সাড়ে তিনটার সময় ফিরিয়া বাড়িতে পা দিবামাত্র কমলার দিদি নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিয়া রোদনাবিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা, ওই হতচ্ছাড়া পেভাকে বাড়ি ঢুকতে দিও না। ও—ও একটা শয়তান। আর—আর আজই আমাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও, আমি একদণ্ডও এখানে থাকতে চাই না।

কমলা অবাক হইয়া দেখিল, দিদির দুই চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার চুল ও গায়ের কাপড় হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, মনে হইল, এইমাত্র সে পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিতেছে।

কমলার মা স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, কমলি, তুই ওপরে যা।

নির্ম্মলার সংগে মায়ের কি কথা হইল, কমলা শুনিতে পাইল না।

কিন্তু দিদি যখন কিছুক্ষণ পরে উপরে আসিয়া সিক্তবস্ত্রেই বিছানায় শুইয়া পড়িল, তখন সেও পিছনে পিছনে তাহার পাশে গিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সংকুচিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দিদি ?

বিছানা হইতে মুখ না তুলিয়াই নির্ম্মলা বলিল, কিছু নয়। তুই যা।

মিনতি করিয়া কমলা বলিল, বল না দিদি ; আমার বড্ড ভয় করছে।

নির্ম্মলা উঠিয়া বসিয়া বলিল, ওই হতভাগা প্রভাস আমার গায়ে হাত দিয়েছিল।

অতিশয় বিস্মিত হইয়া কমলা কহিল, হাত দিয়েছিল তা কি হয়েছে ?

নির্ম্মলা গর্জ্জিয়া উঠিল, কি হয়েছে ! তুই কোথাকার ন্যাকা ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেরাসিন তেল ঢেলে গা পুড়িয়ে ফেলি। আমি আজই ও'র কাছে চ'লে যাব, এক রাত্তিরও আর এখানে থাকব না। হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তোর না হয় বিয়েই হয় নি, কিন্তু বয়স ত হয়েছে, বুঝতে ত শিখেছিস। বল দেখি, বর ছাড়া আর কেউ গায়ে হাত দিলে কি মনে হয় ? এখনও আমার গা ঘেন্নায় শিউরে শিউরে উঠছে। যাই, আর একবার পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

* * * *

তারপর কমলার বিবাহ হইয়াছে, স্বামীকে সে ভালবাসিয়াছে, নিজের দেহের অতুল মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। কিন্তু স্মৃতির হাত হইতে নিস্তার নাই—ভুলিবার পথ নাই। ভোলা যায় না। তাহার মস্তিষ্কের উপর দুরপনেয় স্মৃতির কালি দিয়া ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। নড়িতে চড়িতে প্রতি পদে তাহার মনে হয়—নাই, নাই, তাহার কিছু নাই। স্বামীকে সে প্রতি পলে বঞ্চনা করিতেছে, সন্তানের নির্ম্মল ললাটে

পংকতিলক আঁকিয়া দিয়াছে। পত্নীত্বের, মাতৃত্বের অধিকার তাহার নাই। সে কলুষিতা।

জাগ্রতে স্বপ্নে সদাসর্ব্বদা আশংকায় কণ্টকিত হইয়া আছে—যদি কেহ জানিতে পারে, যদি কেহ সন্দেহ করে?

শ্রীমতী পাঠিকা, ঐ যে দুর্ভাগিনী তোমাদের হাসি-গল্পের মজলিস ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, উহাকে তোমরা চিনিবে না। ব্যথার ব্যথী যদি কেহ থাকে হয় ত সন্দেহ করিবে, কিন্তু সেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না।

অথচ ছদ্মবেশ পরিয়া যাহারা জীবনের পথে চলে, তাহাদের পদে পদে আশংকা। দুর্দ্দিনের ঝ'ড়ো হাওয়ায় ছদ্মবেশ উড়িয়া যায়, তখন রিক্ত নগ্ন স্বরূপ লইয়া তাহাদের লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়। সে দুর্দ্দিন নারীর জীবনে যখন আসে, তখন সান্ত্বনা দিবার, প্রবোধ দিবার আর কিছু থাকে না।

মেয়েদের হাসি-গল্পের মজলিস হইতে ফিরিয়া কমলা মেয়ে কোলে করিয়া ভাবিতেছিল সেই কংকালটারই কথা। মেয়ে নিজ মনে খেলা করিতেছিল, কথা কহিতেছিল, কিন্তু সে কথা কমলার কানে যাইতেছিল না।

স্বামীর জুতার শব্দে চমক ভাঙিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। হীরেন আসিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল, তোমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন—প্রভাসবাবু। তোমাদের সংগে খুব জানা-শোনা আছে শুনলাম। তোমাকেও ছেলেবেলা থেকে জানেন বললেন; তাই তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলুম।

ফিট হইলে যেমন মানুষের শরীর শক্ত হইয়া যায়, তেমনই ভাবে

শরীর শক্ত করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে কমলা বলিয়া উঠিল, তাড়িয়ে দাও, দূর ক'রে দাও, ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। আমি—না না—উঃ—। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার কপাল স্বামীর জুতার উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল।

ট্রেণে আধঘণ্টা

ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে মণীশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠিয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটা পঁচিশের প্যাসেঞ্জার ধরিয়া আজ বাড়ি ফিরিবার কোনো আশাই তাহার ছিল না; করুণাকেও বলিয়া আসিয়াছিল যে সকালের গাড়ীতে অন্যান্য বরযাত্রীদের সঙ্গে সে ফিরিবে। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আজ বৈকালের গাড়ীতে এক বন্ধুর বিবাহে তাহারা বরযাত্রী আসিয়াছিল। পাশাপাশি দুটি ষ্টেশন—মাঝে মাত্র পনের মাইলের ব্যবধান, ট্রেণে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে এগারোটা পঁচিশের পর রাত্রে আর গাড়ী নাই। তাই স্থির হইয়াছিল যে, রাত্রে ফেরা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে, পরদিন প্রাতে ফিরিলেই চলিবে। সকলেই প্রায় রেলের কর্ম্মচারী—রেল তাহাদের ঘর-বাড়ি।

এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া অন্যান্য বরযাত্রীরা যখন গাড়ী ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া পান-সিগারেটের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল, সেই ফাঁকে মণীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িয়াছিল। বিবাহ বাড়ি হইতে ষ্টেশন পাকা

দুই মাইল—এই কয় মিনিটে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিল। চুরি করিয়া বন্ধুর বিবাহের আসর হইতে পলাইয়া আসার জন্য পরে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে তাহাও বুঝিতেছিল, কিন্তু তবু রাত্রেই বাড়ি ফিরিবার দুরন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। বাসায় আর কেহ নাই—করুণা সারারাত একলা থাকিবে—দিনকাল খারাপ, এমনি কয়েকটা কৈফিয়ৎ সে মনে মনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

করুণার জন্য বস্তুত ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। ষ্টেশনের কাছেই মণীশের কোয়ার্টার, আশেপাশে অন্যান্য রেল-কর্ম্মচারীদের বাসা, আজিকার বরযাত্রীদের মধ্যে তাহার মত অনেকেই তরুণী স্ত্রীকে একলা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে নাইট ডিউটির সময় সকলকেই তাহা করিতে হয়, কখনো কাহারও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। তবু যে মণীশ রাত্রেই বাড়ি ফিরিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ—; কিন্তু ওটা একটা কারণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, মণীশের মাত্র দুই বছর বিবাহ হইয়াছে এবং বৌ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—এমন বদনামও তাহার রটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কৈফিয়ৎ হিসাবে ওকথা উত্থাপন করা অতীব লজ্জাকর।

সে যাহোক্, বারটার মধ্যেই সে বাড়ি পৌঁছিয়া যাইবে, আধঘণ্টার পথ। হয় ত করুণা লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পরম আরামে ও গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় ত কেন, নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, করুণা মোটে রাত জাগিতে পারে না। মণীশকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখে বিস্ময় ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। মণীশ পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। ট্রেণ তখন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কামরার মধ্যে দুইটি লোক। একজন একটা বেঞ্চি জুড়িয়া লম্বাভাবে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া ছিলেন; গোলাকৃতি থলথলে মুখমণ্ডলে হপ্তাখানেকের দাড়ি গজাইয়া কৃষ্ণতার একটা গাঢ়তর প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল; তিনি শুইয়া শুইয়া অনিমেষ চক্ষে মণীশকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অপর ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়—সেও একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া অন্য ধারের বেঞ্চির কোণে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল এবং পরম কৌতূহলের সহিত মণীশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার চেহারা রোগা—হাড় বাহির করা, গাল বসিয়া গিয়া চোয়ালের অস্থি অস্বাভাবিক রকম উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, দুই চোখের কোলে গভীর কালির আঁচড়। এই দুই যাত্রীর মধ্যে একটা বেশ রসালো গল্প জমিয়া উঠিয়াছিল, মণীশের আগমনে তাহা অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

মণীশ বসিলে রোগা লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কদ্দূর যাওয়া হবে?'

মণীশ বলিল, 'আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব।'

একজাতীয় লোক আছে, রেলে উঠিয়াই অন্য যাত্রীদের পরিচয় গ্রহণ করিবার অদম্য আগ্রহ তাহাদের চাপিয়া ধরে। রোগা লোকটি সেই শ্রেণীর। মণীশের রূপালী বোতাম লাগানো কালো রঙের ওভারকোট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি রেলেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, আমি ও ষ্টেশনের পার্সেল ক্লার্ক।'

লোকটি তখন হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেশ। আসুন এই কম্বলের ওপর বসুন। আমি অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু রেলের বাবুদের মতন এমন মাই-ডিয়ার লোক খুব কম দেখা যায়। কিছুতেই পেছপাও নন। তা মহাশয়ের জলপথে চলা অভ্যাস আছে কি? যদি থাকে মালের অভাব হবে না।'

মণীশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'জলপথ ?'

লোকটি রসিক, একটা শিহরণের অনুকরণ করিয়া বলিল, 'মাঘ মাসের শীত, তার ওপর ট্রেন-জার্নি। শরীর গরম থাকে কি ক'রে, বলুন দেখি !'

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, 'ও, বুঝেছি। না, আমার ও-জিনিস চলে না। কিন্তু আপনি যদি চালাতে চান, কোনো বাধা নেই।'

লোকটি বেঞ্চির তলা হইতে একটি হ্যাণ্ডব্যাগ তুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিল, বোতলের তরল পদার্থ গেলাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিল, 'একলা এ জিনিস খেয়ে সুখ হয় না। ও-ভদ্রলোককে অফার করলুম, তা উনিও এ রসে বঞ্চিত। বলুন দেখি, এর মত ফুর্ত্তির জিনিস পৃথিবীতে আছে কি ?'

মণীশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা ত বটেই।'

গেলাসের পানীয় গলায় ঢালিয়া দিয়া উৎসাহিতভাবে লোকটি বলিল, 'সেই কথাই এতক্ষণ ও-ভদ্রলোককে বলছিলুম, দুনিয়ায় আসা কিসের জন্যে। যতদিন বেঁচে আছি, প্রাণ ভ'রে মজা লুটব, কি বলেন ?'

মণীশ যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা।'

বোতল গেলাস ব্যাগে পুরিয়া নামাইয়া রাখিয়া লোকটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, একটি নিজে ঠোঁটে ধরিয়া মণীশকে একটি দিল। সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আমার নাম চারুচন্দ্র গুপ্ত ইন্সিওরেন্সের দালালী করি, ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। অনেক বাজার ঘেঁটে বেড়িয়েছি মশায় ; কিন্তু এ দুনিয়ার সার বস্তু যদি কিছু থাকে ত সে ওই বোতল, আর—; বুঝেছেন ত ?'

মণীশ সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'হুঁ।'

চারুচন্দ্র গুপ্ত বলিল, 'এতে লজ্জাই বা কি? পুরুষ হয়ে জন্মেছি কি জন্যে? মজা লুটব বলে। কিন্তু মশায়, একটি বিষয়ে আপনাদের সাবধান করে দি, যদি ফুর্ত্তি করতে চান, বিয়ে করবেন না। খবরদার, খবরদার। ও পথে হেঁটেছেন কি সব ভেস্তে গেছে।'

মণীশ কোনো কথা বলিল না, চারু আবার আরম্ভ করিল, 'এই আমাকেই দেখুন না—পনের বছর বয়স থেকে ফুর্ত্তি করতে আরম্ভ করেছি, কখনো ঠকেছি কি? নিজে রোজগার করি, নিজের ফুর্ত্তিতে ওড়াই, কারুর তোয়াক্কা রাখি না। ক্যা মজায় আছি বলুন ত? কিন্তু বিয়ে করলে এটা হ'ত কি? অ্যাদ্দিনে সতেরটা ছানা গজিয়ে যেত। প্যান্-প্যান্ ঘ্যান্-ঘ্যান্, ডাক্তার আর ঘর, একবার ভেবে দেখুন দিকি!'

মণীশ এবারও চুপ করিয়া রহিল। লেপের মধ্যে শয়ান লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, অবিবাহিত জীবনের অপ্রাপ্য সুখৈশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া এখনি তাঁহার মুখ দিয়া নাল গড়াইয়া পড়িবে। তিনি কোনোমতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'যে গল্পটা হচ্ছিল সেটাই হোক না।'

চারু মণীশকে বলিল, 'ওঁকে আমার জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছিলুম, ইতিহাস ত নয়, মহাভারত। পনের বছর বয়স থেকে আজ পর্য্যন্ত কত কাণ্ডই যে করলুম! শুনলে বুঝবেন।' গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কখনো ইলোপ্ করেছেন?'

মণীশ সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না।'

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটি স্মরণ*করাইয়া দিলেন, 'ওটা হয়ে গেছে। শালুকের গল্পটা বলছিলেন।'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, শালুকের গল্পটা। কিন্তু ওতে নূতনত্ব কিছু নেই মশায়। অমন দশটা আমার জীবনে হয়ে গেছে।'

মণীশ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'শালুকের গল্প ?'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, তখন আমি শালুকেয় থাকি। বছর তিনেক আগেকার কথা।—ঠিক পাশের বাড়িতেই, বুঝলেন কিনা, একটি ষোলো বছরের তরুণী। খাসা দেখতে মশাই, রঙ ফেটে পড়ছে, ঠিক বাঁ চোখের নীচে একটি তিল; আর গড়ন—সে কথা না-ই বললুম, মনে মনে বুঝে নিন। এক কথায় যাকে বলে—রমণী! বলুন দেখি, লোভ সামলানো যায় ?

'তার তখনো বিয়ে হয় নি, তবে হব-হব করছিল। আমি দেখলুম, বিয়ে হলেই ত পাখী উড়বে; অতএব তার আগেই—বুঝলেন কি না? মতলব ঠিক করে জানালা দিয়ে চিঠি ফেলতে আরম্ভ করলুম। চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁচুচ্ছে কিন্তু জবাব নেই। সে আগে জানালায় এসে দাঁড়াত, আজকাল আর তাও দাঁড়ায় না; আমাকে দেখে মুখ রাঙা করে সরে যায়। কিন্তু আমিও পুরোনো ঘাগী, অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। লেগে রইলুম। বুঝলুম কিছুদিন খেলবে! তারপর, দিন পনের পরে হঠাৎ একদিন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব গরম হয়ে বললে, 'আপনি আমাকে যদি আর চিঠি দেন, বাবাকে বলে দেব।'

চারু কিছুক্ষণ মনে মনে হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে বলে দেব' কথাটা সব মেয়েরই বাঁধি গৎ, বুঝছেন। ন্যাকামি। আসলে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। আমি আরো প্রেমরসে চিঠি চালাতে লাগলুম। কিন্তু এক হপ্তা কেটে গেল, তবু সে কোনো সাড়াশব্দ দিলে না; অবিশ্যি বাপকেও বললে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

'বাড়ির ঝিটাকে আগে থাকতেই টাকা খাইয়ে হাত করেছিলুম, ঠিক করলুম, এবার আর চিঠি নয়, অন্য চাল চালতে হবে। খবর পেলুম, রোজ সন্ধ্যের পর ছুঁড়ি খিড়কির বাগানে যায়। একদিন শর্ম্মাও

পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। আচমকা আমাকে দেখে ত সে আঁৎকে উঠল, পালাবার চেষ্টা করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালুম, থিয়েটারি কায়দায় বললুম, 'বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার জন্যে।' সে চেঁচামেচি করে লোক ডাকবার চেষ্টা করলে। আমি তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলুম, বললুম, 'চেঁচালে কোনও ফল হবে না। আমি বড জোর দু'ঘা মার খাব, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকালের দফা রফা, সেটা ভেবে চেঁচিয়ে লোক জড় কর।'

মেয়েটা চেঁচালে না বটে, কিন্তু তবু বাগ মানতে চায় না। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্র ঝাডলুম, বললুম, 'আমার দু'জন মুসলমান বন্ধু পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচামেচি গোলমাল করেছ কি তারা এসে মুখে কাপড় বেঁধে—বুঝলে? কিন্তু যদি ভাল কথায় রাজি হও তাহ'লে আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।' চারু আবার ব্যাগটা বাহির করিল, বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটির চোখ হইতে লুব্ধতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর?'

গেলাস গলায় উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া চারু একটু মুখ বিকৃত করিল, তারপর হাসি হাসি মুখে বলিল, 'তারপর আর কি—হে হে—রাজি হয়ে গেল।'

মণীশের হাতের সিগারেট অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নিবিয়া গিয়াছিল, সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া সে এই কাহিনী শুনিতেছিল। এখন হঠাৎ সিগারেটের দিকে দৃষ্টি পডিতেই সে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চারু বলিল, 'কিন্তু হ'লে কি হবে মশাই, মেয়েটা পোষ মানলে না। তারপর থেকে খিড়কির বাগানে আসাই ছেড়ে দিল। ওদিকে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আমারও শালুকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে

এসেছিল।—ব্যাগটা আবার বেঞ্চের নীচে রাখিয়া দিল, 'দিন কয়েক পরে আমিও শালুকে ছেড়ে দিলুম, তার বিয়েটা আর দেখা হ'ল না।' বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ট্রেণের বেগ ডিস্টাণ্ট-সিগ্নালের কাছে আসিয়া মন্দীভূত হইল। চারু আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বাক্সটা মণীশের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, 'খান আর একটা। আপনার ত এসে পড়ল! শুনলেন ত গল্পটা? এর পর আর কোন ভদ্রলোকের বিয়ে করতে সাধ হয়? ভাবুন দেখি, আমার কপালেই যদি ঐ রকম একটি—: নিন না—'

মণীশ হাত নাড়িয়া সিগারেট প্রত্যাখান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশের মুখখানা স্বভাবত খুব ধারাল না হইলেও বেশ সুশ্রী. কিন্তু গত কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যেন কদাকার হইয়া গিয়াছিল। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে থামিতেই সে কম্পিত হস্তে হাতল ঘুরাইয়া নামিবার উপক্রম করিল।

চারু বলিল, 'আচ্ছা, তাহ'লে নমস্কার মশায়।'

মণীশ নামিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সে মনে মনে বলিতেছিল, না, জিজ্ঞাসা করব না, জিজ্ঞাসা করব না: কিন্তু শেষে আর পারিল না, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, 'মেয়েটির নাম কি?'

চারু বলিল, 'নাম? নামটা—রসুন—করুণাময়ী! কিন্তু নামের সঙ্গে চরিত্রের একটুও মিল নেই মশায়, হ্যা হ্যা, আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার!'

* * *

মণিমণ্ডিত-দেহ বিষোদ্গারী সর্পের মত অন্ধকার আকাশে গাঢ় ধূম নিক্ষেপ করিতে করিতে ট্রেণ চলিয়া গেল।

মণীশও একটা হোঁচট খাইয়া প্লাটফর্মের বাহিরে আসিল। টিকেট-

কলেক্টর তাহার বন্ধু, ডিউটির জন্য সে বরযাত্রী যাইতে পায় নাই, নিদ্রা-জড়িত স্বরে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, মণীশ শুনিতে পাইল না।

স্টেশন হইতে একশত গজের মধ্যেই মণীশের ছোট্ট লাল ইটের বাসা; অন্ধকার পথ দিয়া এক রকম অভ্যাসবশেই সে সেই দিকে চলিল। মাথার মধ্যে তাহার রক্ত ঘুরপাক খাইতেছিল! করুণা! করুণা এই! আজ দুবছর ধরিয়া সে অন্যের উচ্ছিষ্ট নারীকে নিজের একান্ত আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে। একদিনের জন্যেও সন্দেহ করে নাই যে করুণা তাহাকে ঠকাইতেছে। উঃ, এই করুণা!

একটা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া সে বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইল। দেখিল তাহার শরীরের সমস্ত পেশীগুলা শক্ত হইয়া আছে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের নখ হাতের তেলোয় বিঁধিয়া জ্বালা করিতেছে। সে জোর করিয়া পেশীগুলা শিথিল করে দিল; তারপর দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলিল। করুণা একটা—

কি করা যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ কি করে? খুন!—হাঁ, খবরের কাগজে ত এমন অনেক দেখা যায়। যাহার স্ত্রী কুমারী অবস্থায় লম্পট দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছে, সে আর কি করিতে পারে? করুণাকে খুন করিয়া নিজে ফাঁসি যাওয়া ছাড়া অন্য পথ কোথায়?

কিন্তু—, মণীশ থমকিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই লম্পটটাকে সে ছাড়িয়া দিল কেন? তাহাকে আগে খুন করিয়া তারপর করুণাকে—

বাড়ির সম্মুখস্থ হইয়া সে দেখিল, তাহার শয়নঘরের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। আলো কিসের? করুণা ত ঘুমাইয়াছে! তবে কি—?

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত গিয়া মণীশ জানালার কাচের ভিতর

দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, করুণা মেঝেয় কম্বল পাতিয়া একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া বসাইয়া বই পড়িতেছে।

মণীশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল : তারপর গিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল, চাপা বিকৃতস্বরে বলিল, 'দোর খোল।'

করুণা দোর খুলিয়া দিতেই মণীশ ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিল, তারপর করুণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমি জানতুম তুমি এ গাড়ীতে ফিরে আসবে, তাই শুই নি।'

মণীশের মাথার ভিতরটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। এই কথাগুলির পরিপূর্ণ অর্থ পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহার ছিল না ; তবু সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিল যে, ইহার বেশী আর কেহ কোন দিন পায় নাই, প্রত্যাশা করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নিশীথরাত্রে তাহার জন্য করুণার এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা, ইহার তুল্য পৃথিবীতে আর কি আছে ?

'করুণা!'

সহসা সে দুই হাত বাড়াইয়া করুণাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। এত জোরে চাপিয়া ধরিল যে, করুণার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি ?'

মণীশ তাহার গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু না। ট্রেণে আসতে আসতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঃ! এমন বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলুম! চল শুইগে।'

আংটি

হীরার আংটির হীরাটা যখন আল্‌গা হইয়া যায় তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ান নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিষয়ী, সাবধান।

ক্ষেত্রমোহনের আংটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল। শোকটা সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটা পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয় ত হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্টভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে —সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখ-ধাঁধানো উগ্র প্রগল্‌ভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালী মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অস্তরাগ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোনো অভাবনীয় কারণে যৌবন টিঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল তাহারই ফলে হয় ত এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়—তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে, বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাটুগেঁয়ে খালাসীর মত 'পুরণ' ফেলিতেছেন বটে— বাম্ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদ্‌মায়েস। মোসাহেবী করা ছিল তাহার পেশা। বড়লোকের সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপ্সরালোকের

দ্বার পর্য্যন্ত পেঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁস মাতালের পকেট হইতে মণি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা অস্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপ্সরালোকের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র!

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল! ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্ব্বাক নীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ির দোতালার গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রের বাসা। শয়ন ঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরেই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্লমুখে ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রর বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চটপটে বাক্‌পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'সব ঠিক করে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত!'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জ্বলজ্বলে চোখ-ঝলসানো হাসি। তাঁহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক্ করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রের এ হাসি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কি হ'ল ?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রের কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল—এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে সে ভালবাসিত, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানালার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তোমাকে অ্যাদ্দিন বলি নি। এক নতুন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছি; বেশ শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফূর্ত্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়ে পুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধরে খেলাচ্ছি।

'ছোঁড়ার বয়স বেশী নয়—তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু হলে কি হবে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কান কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হক্তে'ল ঘুঘু। এই দ্যাখ না, একমাস ধরে তেল দিচ্ছি এখনো একটি সিকি পয়সা বার করতে পারি নি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আন্‌বে, নয় ত দারোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু'পয়সা বাঁচাব সে গুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল—কিন্তু মদের গেলাস ছোঁবার আগে কি করে জান ? টাকা কড়ি, মায় হাতের আংটি পর্য্যন্ত দেরাজে বন্ধ করে চাবিটি ঐ শালা দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলে—যাও, মৌজ কর! এই বলে তাকে একেবারে বাড়ির বার করে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—5গুাল ব্যাটাচ্ছেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল; বলিল, 'তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি ?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'দেখলুম ও

শালা পগেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘাল করা যাবে না—একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চড়ে গেছে—আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চক্‌চকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

'চুরি করবে?'

'হ্যাঁ। ঢের খোশামোদ করেছি, আর নয়; এবার একহাত ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে দেব। টাকাকড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশী রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন—কিন্তু একটা হীরের আংটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ করে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাঁক করেছি। উঃ! কী হীরেটা মাইরি; চপলা, যদি দেখো চোক্ ঝল্‌সে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কাণাকড়ি কম নয়। যদি পঁচিশ টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'সে ভয় নেই। বন্দোবস্ত সব পাকা করে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারটা মধ্যে ব্যাটা বেরুবে—সমস্ত রাত বাড়ি ফিরবে না—' বিমনা ভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে কিছুতেই বল্‌লে না; হয় ত নটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে—কিন্তু সৌদামিনী ত মেনা মিত্তিরের; যাক গে, যে চুলোয় খুশী যাক্। আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ি থাকবে না। দারোয়ানটা বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। ব্যাস, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্ত্তারাও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট্ করে গিয়ে ঢুকব। তারপরেই গুদাম সাবাড়—মাল তস্‌রুপাত। শালা লুট লিয়া—শালা লুট লিয়া—' রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে

সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'সরে এস—সরে এস, ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্চে!'

চপলা সরিল না, বলিল, 'কে?'

'নরেন চৌধুরী—সরে এস।'

'কি দরকার? আমাকে ত আর চেনে না।'

'তা বটে!' তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্চ, ফর্সা মতন চেহারা, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি? উনিই নরেন্দ্র চৌধুরী। হাতের আংটিটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল; পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—'হীরেটার দাম কত বললে?'

'হাজার টাকা।' ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—'বেশীও হতে পারে। এবার তোমার ঝুমকো গড়িয়ে দেবই, বুঝেছ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—সস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় বলে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল, 'হুঁ।'

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'চলে গেছে না এখনো আছে?'

চপলার ঠোঁটের উপর দিয়া একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না। চপলা বলিল, 'মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?' ক্ষেত্রের কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল। 'তাই ত, আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান। তুমি সরে এসো! কে জানে—'

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল, খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলে গেছে।'

'যাক, তাহ'লে বোধহয় এম্‌নি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্ক ভাবে ক্ষেত্রের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে—না?'

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—'পারে না! টাকার জন্যে মানুষ পারে না এমন একটা দেখাও ত দেখি। খুন জখম জাল ফেরেব্বাজি—দুনিয়াটা চলছে ত ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হ'লে কারুর একদণ্ড চলে? তবে আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রাণ করেছে। যেমন করে হোক ওর ঐ আংটি গাপ করবই।'

আলস্যভরে দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল, 'যাই, চুল বাঁধি গে।'

* * * *

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখ দিয়া ফড়েপুকুরের রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ৎ আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ান যায়। রাস্তার গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড় জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দু'ধারে দুটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল পাশের একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবল আছে, সেই টেবলের ডান দিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল—কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগিবে না। তাহার হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়বিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে।

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশালাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না—কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দু'ধারে বাড়ি। কে জানে—যদি কেহ দেশালায়ের আলো দেখিতে পায়। ধূম-পানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল—এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় নরেন চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়া গেল। ক্ষেত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর দরজার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার!

সদর দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠ-গোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোষ্টারের মত সাঁটিয়া গেল। নরেন ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্রচক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আংটি আছে কিনা। না—নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নরেনের পরিপাটি সাজসজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এইসব নিশাচর প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'মাণিক অভিসারে বেরুলেন!' কোনো একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, করুক—সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাংটা করিয়া ছাড়িয়া দিক!

কিন্তু এদিকে দরোয়ানটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোট্টাটার আবার কি হইল। ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই ত।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল—সওয়া এগারোটা! তাই ত! কি হইল? দরোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই ত! না—তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দরোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল? তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এক মেহনৎ করিয়াছে—সার্কুলার রোডে ময়দা কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে—আর শেষে—

এই সময় খোট্টা দরোয়ান বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠক্ ঠক্ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দরোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, ক্ষেত্র কাঠ-গোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জ্জন—বাধা বিপত্তির কোনো ভয় নাই। কিন্তু দু'পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই—আর একটু থাক। যদি দরোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে—হয় ত আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দরোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র

অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুতপদে, যেন নিজের বাড়িতে যাইতেছে এমন ভাবে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল!

ক্ষেত্রের পকেটে একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ্চ ছিল, সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁ দিকের দরজার উপর ফেলিল।

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র আর একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চ্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল; সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ্চ জ্বালিল।

টর্চ্চের আলো একটা টেবলের উপর গিয়া পড়িল। টেবলের উপর বিশেষ কিছু নাই—কাগজ চাপা, ব্লটিং প্যাড, দোয়াত কলম। টেবলের আশে পাশে দু'তিনটা চেয়ার অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। টেবলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল। ডান ধারের দেরাজগুলা খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারিটি দেরাজ। নরেন উপরের দেরাজে আংটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল—কিন্তু আংটির পরিচিত

ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল—আংটি নাই।

আংটি নাই? কোথায় গেল? প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থির নিশ্চয় ছিল, যে এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

তবে কি—?

সে সভয়ে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চ্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল। না—কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয় ত আংটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আল্‌পিন পর্য্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ! সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আংটি ত দূরের কথা, একটা পয়সা পর্য্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু না—নিশ্চয় আছে। হয় ত তাড়াতাড়িতে নরেন ডান দিকের খোলা দেরাজেই আংটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডান দিকের দেরাজগুলো খুলিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাতেই কিছু পাইল না। কতগুলা মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটাকয়েক অশ্লীল বিলাতী উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের মত একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল। তাহার

মনে হইল, এই শূন্য বাড়িখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সংকুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—আর পলাইতে পারিবে না।

এই সময় দূরের কোন গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রর কানে বোমার আওয়াজের মত লাগিল। বারোটা! এতক্ষণ সে এখানে আছে! যদি কেহ আসিয়া পড়ে। নরেনই যদি ফিরিয়া আসে।

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির বাহির হইয়া ভয়ার্ত্ত চোখে একবার চারিদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরের তালা বন্ধ করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যেদিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতেই পারিল না।

* * * * *

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কি অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল! তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—নরেন আংটি পরিয়া বাহির হয় নাই ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে। তবে আংটিটা গেল কোথায়?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজায় কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি স্বতন্ত্র—নীচের তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই, প্রতিবেশীকে না জাগাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষেত্র কোনো কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন ঘরে ফিরিয়া আসিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব। কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। মুখে চোখে জল দিয়া, আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, 'আজ ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'ল! ঘুমুলে নাকি?' ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলার একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

'আংটিটা পেলুম না—বুঝলে?'

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল—'জেগে আছ না ঘুমুলে?

চপলার চোখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মত বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'আংটি!—এ আংটি তুমি কোথায় পেলে!—তুমি কোথায় পেলে—'

বিদ্রোহী

দেবব্রত আমার বন্ধু ছিল না। কিন্তু আজ এই ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণসন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে বহু দূরে বসিয়া ষোল বৎসর পূর্ব্বের এমনি আর একটি সন্ধ্যার কথা বার বার মনে পড়িতেছে। রামতনু লাইব্রেরীর রীডিং রুমে আমরা কয়জন টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া ছিলাম, আর দেবব্রত আমাদের সম্মুখে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো তাহার উগ্র সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহার বজ্রকঠিন মুখ ধীরে ধীরে রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল, ঠোঁট দুটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—

সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিল।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ পড়ি ও সন্ধ্যার পর রামতনু লাইব্রেরীতে বসিয়াই আড্ডা দিই। রামতনু লাইব্রেরী কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার মত আরও গুটিকয়েক প্রবীণ ছাত্রের স্থায়ী আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তন্মধ্যে দেবব্রত ও সুরেনদাদা উল্লেখযোগ্য। বাকিগুলি বিশেষত্বহীন; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

সুরেনদাদা একাদিক্রমে বহু বৎসর ল-কলেজের ছাত্র থাকিয়া, অভিজ্ঞতা, কলেবর ও বয়োমর্য্যাদার বলে সার্ব্বভৌম 'দাদা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম দেশে তাঁহার গুটি তিন

চার পুত্রকলত্র আছে। আমরা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

দেবব্রত আমার সহপাঠি ছিল; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে আমার বন্ধু ছিল না। দেবব্রতের বন্ধুভাগ্যটা ছিল খারাপ; আজ পর্য্যন্ত সে একটি সত্যকার বন্ধু লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

দেবব্রত বড়মানুষের ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পিতা যখন তাহার তরুণ হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা ও আরও অনেক বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এই অভিভাবকহীন যুবক এইবার বহু ইয়ার জুটাইয়া পিতৃ-অর্থ দু'হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিবে। তাহাকে কাপ্তেন পাকড়াইবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছিল। কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছিল; তাহার জীবনযাত্রা বা মতামতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমরা রামতনু লাইব্রেরীর আড্ডাধারিগণ তাহাকে পছন্দ করিতাম না। তাহার বুদ্ধির এমন একটা কুণ্ঠাহীন অনাবৃত নগ্নতা ছিল যে আমাদের চোখে তাহা অশ্লীল দুর্নীতির রূপান্তর বলিয়া মনে হইত। আমরা বাঙ্গালী জাতি অনাবশ্যক তর্ক করিতে পশ্চাৎপদ, এ অপবাদ কেহ কখনও দিতে পারে নাই; কিন্তু দেবব্রতের সঙ্গে তর্ক বাধিলে আমরা কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, তর্কে আর রুচি থাকিত না। তাহার তর্ক করিবার রীতি দেখিয়াই আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, ঋষিবাক্য কিছুই সে স্বীকার করিত না, কেবল বুদ্ধির জবরদস্তি দ্বারা সকলকে কাবু করিবার চেষ্টা করিত। বলা বাহুল্য এরূপ লোক বড়মানুষ হইলেও তাহার সহিত সদ্ভাব রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাহার চেহারা ছিল উগ্র রকমের সুন্দর। ছ'ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ

ধারালো মুখের উপর বাঁকা নাকটা যেন খড়্গের মত উদ্যত হইয়া আছে। চোখের চাহনি এত তীব্র ও নির্ভীক যে, সাধারণতঃ তাহাকে অত্যন্ত দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়।

টাকার গর্ব্ব অবশ্য তাহার ছিল না, কারণ টাকা জিনিষটাকে সে গর্ব্বের বস্তু বলিয়া মনে করিত না। অযথা বড়মানুষী করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, সে হাঁটিয়া কলেজে যাইত। তাহার গর্ব্ব ছিল শুধু বুদ্ধির। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইত, বুদ্ধির বলে সে মানুষের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্হিত ধাপ্পাবাজি ধরিয়া ফেলিয়াছি, তাই আমাদের মত কুসংস্কারচ্ছন্ন অন্ধ জীবের প্রতি তাহার করুণার অন্ত নাই।

তাহার উদ্ধত মতবাদ প্রায়ই নাস্তিকতার পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। মনে আছে, একবার কি একটা আলোচনার প্রসঙ্গে দাদা বলিতেছিলেন যে, বিবাহ নামক সংস্কারটাই মনুষ্য-সমাজকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যাহারা বিবাহ-বন্ধনকে শিথিল করিতে চায় তাহারা সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। দেবব্রত একটা বিলাতী মাসিকপত্রের ছবি দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'বিবাহ জিনিষটার স্বকীয় মূল্য কি?'

দাদা বলিলেন, 'পৃথিবীতে কোন জিনিষেরই স্বকীয় মূল্য নেই, সব আপেক্ষিক। বিবাহ আমাদের মহামূল্য সম্পদ, কারণ সমাজকে সে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।'

'প্রেমের বন্ধন কোথা থেকে এল? বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি?'

দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'বিবাহ আর প্রেমের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে?'

'অনিবার্য্য সম্বন্ধ আছে, এটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন ত ভাল হয়।'

দাদা রুষ্টমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তা যদি নাও থাকে, তবু সমাজের বন্ধন হিসাবে বিবাহের মূল্য কমে না।'

'কিন্তু তাহ'লে প্রশ্ন উঠে, একটা কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখা কি সংগত?'

'কৃত্রিম বন্ধন? মানে?'

'যে বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধরা দেয় না, সে বন্ধন কৃত্রিম নয় ত কি?'

দাদা চটিয়া উঠিলেন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মুখে কোনও কথা বাধে না, তিনি মোটা গলায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন! অর্থাৎ তোমার পূর্ব্বপুরুষদের বিবাহকেও তুমি পবিত্র বলে মনে কর না?'

দেবব্রতও মুষ্টি পাকাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'না, স্বীকার করি না—

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে তার হৃদয় নহিলে
মনে কি ভেবেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সগর্জ্জনে আবৃত্তি করিলে শুনিতে মধুর হয় না; বিশেষতঃ নিজের পূর্ব্বপুরুষদের বিবাহ অপবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে যে কুণ্ঠিত হয় না এরূপ বর্ব্বরের মুখে। দাদাও গুম হইয়া গেলেন, এত বড় ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি তাহ'লে কিছুই মান না বল?'

দেবব্রতও কণ্ঠস্বর কিয়ৎ পরিমাণে নামাইয়া বলিল, 'মানি। কেবল একটা জিনিষ।'

দাদা বলিলেন, 'জিনিষটি কি?'

সংক্ষেপে দেবব্রত বলিল, 'প্রেম।'

দাদা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বল কি? বিবাহ মান না, তার মানে বিবাহ-সম্ভূত যত কিছু সম্বন্ধ সবই অস্বীকার কর। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম এ সব তোমার কাছে ভুয়ো। অথচ প্রেম মান—তার মানেটা কি?'

'মানেটা খুব সহজ। ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃস্নেহ এগুলো মানুষের মনগড়া জিনিষ—তাই কখনো কখনো মা নিজের হাতে সন্তানকে খুন করেছে এ কথা শোনা যায় এবং ভ্রাতৃপ্রেম যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা উপলক্ষে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হয় তা সকলেই জানে। সুতরাং ও দুটো ঝুঁটো জিনিষ—খাঁটি নয়। খাঁটি যদি কিছু থাকে ত সে প্রেম—যা আত্মীয়তার অপেক্ষা রাখে না, যার মূল্য আপনার বিবাহের মত আপেক্ষিক নয়, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ; স্বকীয়।'

দাদা বলিলেন, 'হুঁ। প্রেম ত বড় ভাল জিনিষ দেখছি। কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম বা মাতৃস্নেহের চেয়েও ওটা উচ্চ কোনখানে তা এখনও হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

দেবব্রত তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল, 'হৃদয়ঙ্গম হবে কোত্থেকে! হৃদয়ের চারপাশে তিন ইঞ্চি পুরু কুসংস্কার জমা করে রেখেছেন যে। নৈলে, প্রেমই মায়ের মনে গিয়ে মাতৃস্নেহে পরিণত হয় এবং ভ্রাতার বুকে প্রবেশ করে, কখনও কখনও লক্ষ্মণের মত ভাই তৈরী করে, এটা বুঝতে দেরী হ'ত না। মাতৃস্নেহ বলে স্বতঃসিদ্ধ কিছু নেই, তা যদি থাকত তা হ'লে প্রত্যেক মা তার সবগুলি সন্তানকে সমান ভালবাসত। কিন্তু

পৃথিবীতে কোনও মা তা বাসে না। এখন দেখছেন যে, মাতৃস্নেহ বলে বস্তুতঃ কিছু নেই! আছে শুধু প্রেম!'

দাদা আবার ধৈর্য্য হারাইলেন; বাস্তবিক এরকম কথা শুনিলে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি দুই বাহু শূন্যে আস্ফালিত করিয়া উগ্র কণ্ঠে কহিলেন, 'মাতৃস্নেহ যদি না থাকে তবে প্রেমও নেই। তুমি প্রেমের এত দালালি করছ কেন হ্যা? আজকাল প্রেম করছ বুঝি?'

দেবব্রত এবার সজোরে হাসিয়া উঠিল, বেশ প্রাণখোলা সকৌতুক হাসি। বলিল, 'দাদা, প্রেম কি চেষ্টা করে করা যায়? ওটা সহজ—যত্নসাধ্য নয়—তাই ওর আর একটা নাম অহৈতুকী প্রীতি।'

দাদা শ্লেষ করিয়া বলিলেন, 'জয় রাধেশ্যাম! হরি হরি বল।'

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম, এবার খুব শান্তভাবে বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'পার।'

'বিবাহকে তুমি যখন সত্য বন্ধন বলে স্বীকার কর না, তখন স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনেও তোমার কোন আপত্তি নেই?'

দেবব্রত বলিল, 'কিছুই না। আর আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?'

'তাহ'লে কুস্থানে যেতেও তোমার কোনও নৈতিক বাধা নেই?'

'কুস্থান?—ও!' দেবব্রত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—'দাদা একদিক থেকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করেছিলেন, তুমি আর এক পথ ধরেছ। না, যাকে তুমি কুস্থান বলছ সেখানে যেতে আমার কোনও বাধা নেই।'

আমি তীক্ষ্ণস্বরে বলিলাম, 'তবে যাও না কেন?'

'রুচি নেই বলে।'

'অর্থাৎ রুচি থাকলে যেতে ?'

'আলবৎ যেতুম, একশবার যেতুম।'

'ও! তাহ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

দেবব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বলবার তোমার কোন কালেই কিছু ছিল না, কেবল 'কুস্থানে'র ভয় দেখিয়ে আমাকে কাৎ করবার চেষ্টায় ছিলে। কিন্তু তা হয় না বন্ধু। ও ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দাও। তার চেয়ে বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ কর, সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা কর; দেখবে সুস্থান কুস্থান বলে কোথাও কিছু নেই, সূর্য্যের আলো সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে। আরও বুঝবে, পৃথিবীতে একটিমাত্র বন্ধন আছে—মাতৃস্নেহ নয়, ভ্রাতৃপ্রেম নয়, জেলখানার গারদ নয়—তার নাম প্রেম। Omnia Vincit Amor! চললুম, যদি পার ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা ক'র।' বলিয়া চক্ষে অসহ্য বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিল।

চিত্তবৃত্তি যাহার এই ধরণের সে যে শীঘ্রই বিপদে পড়িবে তাহা আমরা জানিতাম, বুদ্ধির এমন অমিতাচার ভগবান সহ্য করেন না। কিন্তু স্বখাত-সলিলে দেবব্রত যে এমন করিয়া ডুবিবে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

একটা শনিবারে, রাত্রি ন'টার সময় সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম; গিয়া দেখি দেবব্রত পাশের আসনে বসিয়া আছে। কথাবার্ত্তা বড় কিছু হইল না, যাহার সহিত প্রত্যহ দেখা হয় তাহাকে নূতন কিছু বলিবার থাকে না। অভিনয় শেষ হইলে দু'জনে একসঙ্গে ফিরিলাম। আমার মেস ও দেবব্রতের বাড়ি একই রাস্তার উপর; মধ্যে দশ-বারটা বাড়ির

ব্যবধান। চৈত্র মাসের চমৎকার রাত্রি, তাই পথ অনেকটা হইলেও পদ-ব্রজেই চলিয়াছিলাম।

সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল; পথ নির্জন। মিনিট পনের হাঁটিবার পর, একটা গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'আমেরিকায় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ যে উচ্ছৃঙ্খল পথে চলেছে তাতে ও জাতের অধঃপতন হতে আর দেরি নেই।' সদ্যদৃষ্ট ফিল্মটার কথাই মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল।

দেবব্রত একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার তা মনে হয় না। যাকে তুমি উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করছ প্রকৃতপক্ষে তা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ওরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে, সমাজের প্রত্যেকটি বিধি-বিধান নূতন করে যাচাই করে নিচ্ছে! হয় ত শেষ পর্যন্ত তারা সাবেক নিয়মগুলোই মেনে নেবে; কিন্তু বর্ত্তমানে পুরাতন সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ এসেছে, তাই তারা—'টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।' যাদের চিন্তা করবার শক্তি আছে, সংস্কারকে যারা বুদ্ধির আসন ছেড়ে দেয় নি—' দেবব্রতের কথা শেষ হইল না, হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল।

যেখানে আমরা পৌঁছিলাম সেখানে গলিটা অত্যন্ত সংকীর্ণ, ইট বাঁধানো। দু'ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ি, দেয়ালে সংলগ্ন গ্যাসবাতির নীচে অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে। হঠাৎ পাশের একটা দরজা খুলিয়া গেল, পুরুষ কণ্ঠের একটা মস্ত কর্কশ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই অন্ধকার দ্বারপথ দিয়া একটি স্ত্রীমূর্ত্তি যেন প্রবল ধাক্কা দ্বারা তাড়িত হইয়া একেবারে দেবব্রতের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। দরজা আবার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

আকস্মিক সংঘাতের তাল সামলাইয়া দেবব্রত স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া ফেলিল। গ্যাসের আলোয় দেখিলাম, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে,

পরণের শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া প্রায় লজ্জা-নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে ব্যাকুল ত্রাসে একবার আমাদের দিকে তাকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সেই বন্ধ দরজার উপর আছড়াইয়া পড়িল, চাপা রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'খোল—ওগো—দোর খুলে দাও।'

দ্বারের অপর পার হইতে কিন্তু কোন সাড়া আসিল না। সে আবার কবাটে ধাক্কা দিল, কিন্তু এবারও উত্তর আসিল না। তখন সে বুকভাঙা ব্যাকুলতায় সেই দরজার সম্মুখে মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

আমরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া ছিলাম। এখন দেবব্রত অগ্রসর হইয়া কহিল, 'শুনুন। এটা কি আপনার বাড়ি?'

সে মুখ তুলিয়া আমাদের যেন প্রথম দেখিতে পাইল; লজ্জায় তাহার বসনহীন দেহ সংকুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেল। ছেঁড়া কাপড়ে কোনও মতে দেহ আবৃত করিয়া সে জড়সড়ভাবে দরজার পৈঠার উপর বসিয়া রহিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

দেবব্রত আবার প্রশ্ন করিল, 'যিনি আপনাকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন তিনি কি আপনার স্বামী?'

মেয়েটি হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত তখন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল, 'দেখুন, আপনাকে এভাবে ফেলে আমরা যেতে পারছি না। এ বাড়িতে যদি আপনার কোন আত্মীয় থাকে ত বলুন, তাকে ডাকবার চেষ্টা করছি; আর যদি না থাকে তাও বলুন, দেখি যদি অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি।'

মেয়েটি তখন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'আমার কেউ নেই।'

'কেউ নেই ! অর্থাৎ যিনি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন আপনি তাঁর স্ত্রী নন ?'

মেয়েটা মাথা নাড়িল।

'রক্ষিতা ?'

বিদ্যুদাহতের মত মুখ তুলিয়া সে আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত বলিল, 'হুঁ, সহরে আর কোথাও যাবার যায়গা আছে ?'

মেয়েটার চাপা কান্না হঠাৎ কোলের ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, 'না।'

দেবব্রত কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুপুররাত্রে অজানা পল্লীতে হঠাৎ এই বিশ্রী ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই ফাঁকে বলিলাম, 'দেবব্রত, চল আমরা যাই—'

দেবব্রত মুখ তুলিয়া মেয়েটাকে বলিল, 'পুলিসে যেতে রাজী আছেন ?'

মেয়েটা এবার মুখ তুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, 'না —আমি পুলিসে যাব না—'

তাহার কপালে রক্তের সহিত চুল জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, চোখ দিয়া ধারার মত জল গড়াইয়া পড়িতেছিল ; পতিতা হইলেও দেখিলে কষ্ট হয়। কিন্তু দেবব্রত এই সময় যাহা করিয়া বসিল, তাহা সহানুভূতি বা সমবেদনা নয়, চূড়ান্ত পাগলামি। পতিতার প্রতি দরদ দেখাইতে দোষ নাই, কিন্তু দরদেরও একটা সীমা আছে !

দেবব্রত মেয়েটার খুব কাছে গিয়া বলিল, 'পুলিসে যেতে হবে না, আপনি আমার বাড়িতে চলুন। যাবেন ? আমি একলা থাকি, কিন্তু কোনও ভয় নেই। আসুন।'

মেয়েটা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে বলিলাম, 'দেবব্রত, কি পাগলামি করছ ?'

দেবব্রত আমার কথা শুনিতে পাইল না, মেয়েটার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, 'যাবেন ত? না গেলে এই রাত্রে কোথায় থাকবেন? যাবার যায়গাও ত আপনার নেই। কি, আসবেন? আপনি আশ্রয়হীন, আমার বাড়ি আছে, তাই সেখানে যেতে অনুরোধ করছি। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসতে পারবেন। ভয় করবেন না, আমার মনে কোনো মৎলব নেই।'

মেয়েটা তবু মৌন হইয়া রহিল।

তখন দেবব্রত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয় কণ্ঠে বলিল, 'চলুন। আমার বাড়ি এখান থেকে মাইল খানেক দূর—হেঁটে যেতে পারবেন না, বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।

মেয়েটি বাধা দিল না, আপত্তি করিল না, যন্ত্র-চালিতের মত দেবব্রতের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সদর রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দেবব্রত তাহাকে তুলিয়া দিয়া আমাকে বলিল, 'এস মন্মথ।'

আমি শক্ত হইয়া বলিলাম, 'না, তুমি যাও। আমি হেঁটেই যাব।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবব্রত আমার পানে তাকাইল; তাহার মুখে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'ও আচ্ছা।' তারপর নিজে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, 'হাঁকো।'

ট্যাক্সি চলিয়া গেল

সোমবার সন্ধ্যায় দেবব্রত লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিবামাত্র দাদা বলিলেন, 'এই যে! শনিবার রাত্রে খুব রোমান্স করেছ শুনলুম?' বলা বাহুল্য, ঘটনাটা আমি আড্ডায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম।

দেবব্রত চেয়ারে বসিয়া সহজভাবে বলিল, 'হুঁ্যা।'

সকলেই উৎসুক ভাবে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু দেবব্রত যখন আর কিছু বলিল না, তখন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর, রোমান্স গড়াল কতদূর ?'

দেবব্রত হাল্কা ভাবে হাসিয়া বলিল, 'বেশী দূর গড়ায় নি এখনও, এই ত সবে আরম্ভ।' বলিয়া একটা মাসিক পত্র টানিয়া লইল।

গর্হিত কার্যের প্রতি যথোচিত ঘৃণা থাকিলে সেই সঙ্গে একটু কৌতূহল দোষাবহ নয় ; বস্তুতঃ অধিকাংশ সজ্জনের মনেই দুষ্কার্য সম্বন্ধে ঘৃণা ও কৌতূহলের নিবিড় সংমিশ্রণ দেখা যায়। দাদাও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, 'তবু ? ভাব-সাব আলাপ-পরিচয় হয়েছে ত ?'

দেবব্রত মুখ তুলিয়া বলিল, 'খুব সামান্য। সেই যে সে-রাত্রে কাঁদতে আরম্ভ করেছে এখনও থামে নি। কাজেই আলাপের চেয়ে বিলাপই বেশী হয়েছে।'

'পরিচয় জানতে পার নি ?'

'পরিচয় নূতন কিছু নেই। গেরস্ত-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। বিয়ে হয় নি—স্কুলে পড়ত। মাস ছয়েক আগে একটা লোকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। সেই লোকটার সঙ্গেই ছিল—লোকটা মাতাল ; তারপর পরশু রাত্রের ঘটনা।'

'তাহ'লে কুলত্যাগিনী—পেশাদার নয় ?' দাদা কথাগুলি বেশ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন।

'হ্যাঁ—কুলত্যাগিনী।'

'কোন্ কুল আলো করে ছিলেন, তার কোন সন্ধান পেলে ?'

'সন্ধান নিই নি।'

'হুঁ। এখন তাহ'লে পদ্মিনীটি তোমার স্কন্ধেই আরোহণ করে

আছেন ? তুমিও একলা মানুষ, তার উপর কুসংস্কারের বালাই নেই। যোগাযোগটা হয়েছে ভাল। তা—এখন এই ভাবেই বনবাস চলবে তাহ'লে ?'

'চলা ছাড়া আর উপায় কি ? যতক্ষণ তিনি নিজে কোথাও না যাচ্ছেন ততক্ষণ আমি তাড়িয়ে দিতে পারছি না।' বলিয়া সম্মুখস্থ কাগজে মনোনিবেশ করিল।

তাহার প্রখর বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল মুখখানার দিকে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুঃখ হইতে লাগিল। সমাজ-বন্ধন যে মানে না, বিবাহকে যে কৃত্রিম বন্ধন বলিয়া উপহাস করে, তাহার নৈতিক চরিত্র যে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অতি সহজে নির্ব্বিঘ্নে অধঃপথে যাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায় ?

দাদাও সেই কথাই বলিলেন ; একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাক, এতদিন শুধু মুখেই দুর্নীতি প্রচার করছিলে, এবার সত্যি সত্যিই গোল্লায় গেলে ?'

চকিতে মুখ তুলিয়া দেবব্রত বলিল, 'তার মানে ?'

'তার মানে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমার ভবিষ্যৎ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর সকলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখতে পাবে।'

দেবব্রত হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, 'দাদা একজন পাকা রোমাণ্টিস্ট। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু রস মরে নি। বৌদি'র বয়স কত হবে দাদা ?'

দাদা ক্রুদ্ধ ভাবে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীকে লইয়া রসিকতা তিনি পছন্দ করিতেন না।

ইহার পর যখনই দেবব্রত আড্ডায় আসিত, তখনই আমরা তাহাকে নানাবিধ প্রশ্নের আড়ালে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা দিতাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিল ভয়ানক পিউরিটান, তাহার নাম বোধ হয় জিতেন—সে দেবব্রতের কথা বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহীর কিন্তু কিছুমাত্র ভাব-বিপর্যয় দেখা গেল না। সে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দিত; আশ্রিতা যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সহজভাবে উত্তর দিত—লুকোচুরি করিত না। মেয়েটার নাম অণিমা—সে দিব্য আরামে দেবব্রতের বাড়িতে বাস করিতেছে, চলিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ নাই; দু' জনের মধ্যে পরিচয় বেশ ঘনীভূত হইতেছে; এ সমস্ত খবর তাহার নিজের মুখেই শুনিতে পাইতাম। কেবল একটা প্রশ্ন সোজা ভাবে বাঁকা ভাবে অনেক প্রকারে করিয়াও আমরা জবাব পাইতাম না। দেবব্রত কখনও গম্ভীর হইয়া থাকিত, কখনও হাসিয়া এড়াইয়া যাইত; উত্তরটা আমরা অবশ্য মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম।

ক্রমে দেবব্রতের আড্ডায় আসা কমিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে যখন আসিত, তখন তাহার মুখে একটা অতৃপ্ত ক্ষুধিত ভাব দেখিয়া আমরা মনে মনে হাসিতাম। বেশীক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। শেষে তাহার লাইব্রেরীতে আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

কলেজেও তাহাকে দু'মাস দেখিলাম না। বুঝিলাম, পড়াশুনায় আর মন নাই, এখন সে অন্য পথে চলিয়াছে। দাদা মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন, 'ছোঁড়া একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। জানতুম, ওরকম চিত্তবৃত্তি যার, সে একদিন না একদিন অধঃপাতে যাবে। তবু আপশোষ হয়, বুদ্ধির দোষে ছোঁড়া নষ্ট হয়ে গেল।'

আমারও দুঃখ হইত। সে রাত্রে সেই গৃহ-নিষ্কাশিতা মেয়েটার

রক্তমাখা মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া যদি তাহার শিভাল্‌রি না জাগিত, হয় ত কোনোদিন ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিত, ক্রমে বুদ্ধির অহংকারদৃপ্ত নাস্তিকতাও কাটিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর তাহার উদ্ধার নাই। অধঃপথের স্বাদ একবার যে পাইয়াছে সে আর ভাল পথে ফিরিবে না।

তার পর একদিন শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় তাহাকে শেষ দেখিলাম। মাস তিনেক তাহাকে দেখি নাই। লাইব্রেরীতে আমরা সকলে বসিয়া ছিলাম, সে আসিয়া ছড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইল।

আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, ধারাল মুখ যেন মাংসের অভাবে আরো ধারালো হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠে একটা শ্রীহীন শুষ্কতার আভাস।

আমরা কোনও সম্ভাষণ করিলাম না; আমার মনে হইল, দেবব্রত যেন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও আমাদের মধ্যে যোগসূত্র নাই। সেও যেন এই দূরত্বের ব্যবধান বুঝিতে পারিল, গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, 'দাদা, আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।'

দাদা নিরুৎসুক ভাবে বলিলেন, 'অনেক দিন পরে দেখছি। ব'স। কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ে করছ নাকি?'

দেবব্রত বসিল না, বলিল, 'হ্যাঁ বিয়ে করছি। আত্মীয় স্বজন আমার কেউ নেই, বন্ধুর মধ্যে আপনারা। তাই নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, সশরীরে উপস্থিত থেকে শুভকার্য্য সম্পন্ন করাবেন।' তাহার শুষ্ক মুখে পরিহাসের চেষ্টা ভাল মানাইল না।

দাদা সহসা জবাব দিলেন না; পকেট হইতে কয়েক খণ্ড সুপারি বাহির করিয়া গালে ফেলিয়া চিবাইলেন, তারপর বলিলেন, 'বিয়ে করছ?

বিয়েটা অবশ্য বন্ধন, তোমার মত জ্ঞানী লোক ইচ্ছে করে কেন এ ফাঁস গলায় পরছে বোঝা যাচ্ছে না, তা সে যাক। তোমার সেই অপদেবতাটি ঘাড় থেকে নেমেছে, এতেই আমরা খুশী। কোথায় বিয়ে করছ?'

দেবব্রতের মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি তাকেই বিয়ে করছি।'

দাদার সুপারি-চর্ব্বণ বন্ধ হইয়া গেল; আরও বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলাম। তাহাকেই বিবাহ করিতেছে! সে কি!

দাদা বলিলেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না! যে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে তুমি নিজের কাছে রেখেছিলে তাকেই এতদিন পরে বিয়ে করতে চাও—এই কথাই কি আমাদের জানাতে এসেছ?'

দেবব্রত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কথা বাহির করিল, 'সে ভ্রষ্টা নয়। ছেলে মানুষ—একজনের প্রলোভনে পড়ে—কিন্তু সে সত্যই মন্দ নয়, আমি তার পরিচয় পেয়েছি—' দেবব্রতের এরকম কণ্ঠস্বর আমি কখনও শুনি নাই, সে যেন মিনতি করিতেছে। তাহার ঠোঁট দুটা কাঁপিতে লাগিল।

দাদা কঠিন স্বরে বলিলেন, 'ভাল-মন্দের বিচারক তুমি একলা নয়, আমরাও কিছু কিছু বিচার করতে পারি। মাথার উপর সমাজ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা দু'জনে যেভাবে ছিলে সেই ভাবেই থাকলে পারতে, তাতে নিন্দে হ'ত বটে, কিন্তু সমাজের মুখে চুণকালি পড়ত না। এ বিয়ের ভড়ংয়ে দরকার কি?'

তেমনি পাণ্ডুর মুখে দেবব্রত বলিল, 'দাদা, আমি—আমরা একবাড়িতে আছি বটে, কিন্তু কখনো—' তাহার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পূর্ব্বতন তীক্ষ্ণতা ফিরিয়া আসিল, 'ছি! আপনি কি মনে করেন, যার মন পাই নি তাকে আমি—'

দাদা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—'ও, সেই পুরাণো পদ্য—"অপবিত্র ও কর-পরশ"।' দাদা আবার খানিকটা হাসিলেন, 'যা হোক এতদিনে মন পেয়েছ তাহ'লে ?'

'পেয়েছি বলেই মনে হয়।'

'একেবারে অহৈতুকী প্রীতি ! খাঁটি জিনিষ বটে ত ? ও বাজারে মেকিও চলে কি-না তাই জিজ্ঞাসা করছি। সে যাক্। তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছ। তুমি আশা কর আমরা এই বিয়েতে যোগ দেব ? কেন—তুমি বড়লোক বলে ?'

দেবব্রত নীরবে মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বিবর্ণ, লাঞ্ছিত মুখখানা দেখিয়া আমার ক্লেশ হইতে লাগিল। দাদার কথাগুলা সত্য হইলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই সুরটা নরম করিবার জন্য আমি বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না, একজন অপরিচিতা নারীকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে চাই—কিন্তু এ রকম একটা অনুষ্ঠানে আমি—'

দেবব্রত আমার পানে চাহিল, তাহার চোখের মধ্যে একটা কাতর অনুনয় দেখিতে পাইলাম। সে বলিল, 'মন্মথ, তুমিও আমার বিয়েতে যাবে না ?'

আমি দাদার দিকে চাহিলাম, দাদা জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'যার ইচ্ছে যেতে পারে, কিন্তু আমি এসব ভ্রষ্টাচারের মধ্যে নেই। সমাজের মাথায় যারা লাথি মারে, তারা সমাজের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে কোন্ মুখে ?'

দেবব্রত আবার বলিল, 'মন্মথ তুমি—'

আমি মাথা নাড়িলাম—'আমি সত্যই দুঃখিত, কিন্তু আমি পারব না।'

দেবব্রত আর সকলের দিকে ফিরিল, 'তোমরা কেউ যাবে না ?'

সকলেই মাথা নাড়িল।

দেবব্রত কিছুক্ষণ হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িটা তুলিয়া লইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'আচ্ছা বেশ—'

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না; মনে হইতে লাগিল তাহার কাছে কত বড় অপরাধ করিতেছি।

দেবব্রত চলিয়া গেল।

তারপর ষোল বৎসর দেবব্রতকে দেখি নাই। এতদিনে তাহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেল। কেমন আছে, কোথায় আছে জানি না, হয় ত সেই পুরাতন বাড়িতেই বন্ধুহীন আত্মীয়হীন ভাবে বাস করিতেছে।

দেবব্রত বিবাহের বিরোধী ছিল, তবু কেন সে সেই মেয়েটাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আজও ভাল বুঝিতে পারি নাই। হয় ত যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল, অন্যে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে তাহা সহ্য করিতে পারে নাই; তাই সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সমস্ত বুদ্ধির অহংকার বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। কিম্বা —কিন্তু আর কি হইতে পারে ?

সেদিন দুষ্কৃতির প্রশ্রয় আমরা দিই নাই; তাহাকে অশেষ ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাহার ভালবাসার পাত্রীকে অপমান করিয়াছিলাম। অন্যায় করিয়াছিলাম, এমন কথাও বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি না। তবু আজ এই ক্লান্তবর্ণ সন্ধ্যায় তাহার সেদিনকার পীড়িত বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া মনটা অন্যায় ভাবে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন তাহারা কেমন আছে—কে জানে, আছে কি-না তাই বা কে জানে! আমাদের সার্ব্বভৌম 'দাদা'র ধারণা, দুষ্কৃতেরা অধিকদিন ধরার ভার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায় না।

দেহান্তর

বরদা বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনও সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—'

নিদাঘকাল সমুপস্থিত। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য্য প্রচণ্ড হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্য্যের প্রচণ্ডতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না; পরন্তু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্য আমরা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য সন্ধ্যার পর ক্লাবের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্ব্বাকাশে বেশ একটি নধর চাঁদ গাছপালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয় পরস্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যই ঔর্দ্ধদেহিক আবরণ মোচন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল। চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেই সঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর আরও সহজে স্নিগ্ধ হয়। আমরা সতৃষ্ণভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না—' ইত্যাদি, তখন আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মতো সূক্ষ্মাগ্র এই প্রস্তাবনাটি যে অচিরাৎ ফাল হইয়া গল্পের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ভূতের গল্প শোনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত্রি অনুকূল নয়, এজন্য শীতের সন্ধ্যা

কিম্বা বর্ষার রাত্রি প্রশস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা করিয়াছে, তখন আর নিস্তার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে হৃষ্টচিত্তে একটি করিয়া ঠাণ্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথ্বী গেলাসের কাণায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল, 'আঃ! দুনিয়াটা যদি মন্ত্রবলে এই সরবতের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতো -'

বরদা বলিল, 'দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝো? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে, যেখানে এখন বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্যি শীত—'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাহাড়ে? কোন্ পাহাড়ে?'

বরদা বলিল. 'মনে কর মসুরী কিম্বা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখীন হাওয়া বদলানোর জায়গা নয়। আমার বড় কুটুম্ব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁর নিমন্ত্রণে মাসখানেক গিয়েছিলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমূল্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের নাম বলতে লজ্জা কিসের?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্চি তার পাত্রপাত্রী সবাই জীবিত, তাই একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে বলতে হচ্চে। মাঝে মাঝে এমন উৎকট ব্যাপার ঘটে যায়—যা হোক, গল্পটা বলি শোনো।'

হিল্ স্টেশনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চালচলন একটু বিলিতি ঘেঁষা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যাণ্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ী ছাড়েন নি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের এক সঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হুইস্কি বা

পোর্ট'—এসব সামাজিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না —শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌঁছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গত্তি লাগল। আমার শ্যালকটি দারুণ মাংসাশী, বাড়িতে রোজ মুর্গি' মাটনের শ্রাদ্ধ চলেছে। তার ওপর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষিদে পায়! যায়গাটা সত্যিই চমৎকার; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশবারো ঘর বাঙ্গালী আছেন, সকলেই ভারি মিশুক, নতুন লোক পেলে খুব খুশী হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী চাকরী করে; মনটা অতি আধুনিক হলেও উগ্র নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদের বাসায় চু' মারত। ছোকরা অবিবাহিত; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে দু'এক পেয়ালা চা কিম্বা কক্‌টেল সেবন করে সন্ধ্যের পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূতপ্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞানী ব্যক্তি। ভূতের প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এইসব বিশ্বাস করেন?'

কথাটা সে হাল্কা ভাবে বললেও গায়ে লাগল; বললুম, 'শিক্ষিত লোকেরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা ?'

'যথা ফ্রয়েডিয়ান্ সাইকো অ্যানালিসিস্ কিম্বা প্যাবলভের বিহেভিয়ারিজম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুদ্ধিমান ছেলে তাই এঁড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ঐখানেই চাপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হপ্তা কেটে গেল। দিব্যি আরামে আছি; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই, গায়ে ঘাম নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই; খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় কচিৎ এসে পড়ে; কিন্তু বেশী দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয়নি জানতুম; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরুণী রয়েছেন। এঁকে আগে কখনও দেখিনি। সুন্দরী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জায় প্রসাধনে বর্ণবাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে বয়স কুড়ি একুশ মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশী হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা আশা করিনি—'

তরুণী হাসিমুখে প্রতি নমস্কার করে বললেন, 'সাপ্তাহিক শপিং করতে শহরে এসেছিলুম ? রাস্তায় প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'হর-জটা'

নামে একটি উঁচু গিরিশিখর আছে ; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর-জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে ; তাই সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যক মতো কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা-কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অন্যদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তাঁর সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, অথচ তাঁর সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রগল্ভতা করবার সাহস কারুর নেই। তাঁর সুকুমারত্বই যেন বর্ম্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেম ঘটিত কোনও জটিলতা আছে ; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্চে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময় ঠিক থাকে ; কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসম্বৃত হয়ে পড়ে ; প্রমথর অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করে দিচ্ছে যে ঐ মেয়েটিকে সে ভালবাসে ; লোকলজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা—তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচিত্র রোমান্স অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায় ?

চায়ের পর্ব্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাকে হর-জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের

তিনজনকে দৃষ্টির আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, ‘একদিন হর-জটায় আসুন না। একটু নিরিবিলি এই যা, নৈলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।’

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি চলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি-সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিগ্যেস করলুম, ‘কি হে ব্যাপার কি? ভেতরে কিছু কথা আছে নাকি?’

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, ‘তুমিও লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমি গুজব শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সাবিত্রীকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।’

‘ওঁর নাম বুঝি সাবিত্রী? তা উনি কি বলেন?’

‘যতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।’

‘মত নেই কেন? হিন্দু সংস্কার? না অন্য কিছু?’

‘তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংস্কার হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হতে পারে।’

জিগোস করলুম, ‘স্বামী কতদিন মারা গেছেন?’

শ্যালক বললেন, ‘তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।’

‘তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল?’

‘সামান্য। খুব রাশভারি জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছর খানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।’

‘মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন?’

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাছাড়া দাস 'অন্ ডিউটি' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তাঁর বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয়?'

'খুব ভাল; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কখনও ওর নামে একটা কথা বলতে পারেনি।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?'

'এ রকম ক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পানে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় বিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল! প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোচ্ছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব। দু'চার কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় নেমন্তন্ন করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। যাবেন?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন—সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে গিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিম্বা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে?

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তাঁর চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধ হয় হবে না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিমন্ত্রণ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্য্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মতো জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিম্বা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশী হব। আশা করি ভাল আছেন।

নিবেদিকা—সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেরিয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরটি উপত্যকা থেকে দেখা যায়. সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে; তার খাঁজে খাঁজে শাদা বাংলোগুলি ধুতুরা ফুলের মতো ফুটে আছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার রাস্তাটি অপূর্ব্ব নয়; তিন মাইল পথ হাঁটতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলুম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে; তবু হর-জটার কুটিল কুণ্ডলীতে সূর্য্যাস্তের আবীর লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন, উৎফুল্ল কলকাকলি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের দেখে তাঁর এই অকৃত্রিম আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামনে কালো ছায়া ফেলে তার আগমনবার্ত্তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেদিন দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র পূর্ব্বাভাস পাইনি। সেই পার্ব্বত্য সন্ধ্যার গৈরিক আলো—মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অশুভ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না। আমার বোধ হয় প্রমথও কিছু আভাস পায়নি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে ড্রয়িং রুমে এসে দেখি চা তৈরী। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই; দু'টি পাহাড়ী মেয়ে মানুষ কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না করে এবং রাত্রে থাকে।

হর-জটায় এখনও বিদ্যুৎবাতি এসে পৌঁছয় নি। কেরোসিন ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্য্যা করতে লাগলেন।

ড্রয়িং রুমের দেয়ালে একটা এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইনিই অকাল-মৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে; চওড়া চিবুকের মাঝখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠোঁটের কোণে যে হাসি আনার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখানার সঙ্গে প্রমথর নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মৃদুকণ্ঠের আওয়াজ হল,—আমার স্বামী।

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঁড়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে

থেকে চকিতে প্রমথর পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানি শান্ত, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না ; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মতো ফটোর সঙ্গে প্রমথর মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়ে মানুষের মন বোঝা সহজ নয় ; বিশেষত মিসেস দাসের মতো মেয়ের মন। কবি বলেছেন, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখ্য সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন একথা নিশ্চয় সত্যি, কিন্তু প্রমথ সম্বন্ধে তাঁর মনে কি কোনও দুর্ব্বলতা নেই ? এই যে আজ তিনি আমার মতন একজন অপরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি শুধুই লৌকিক সহৃদয়তা ? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল ?

প্রমথর অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিষ্ট কম্পাসের কাঁটা, অন্য কোনও দিকেই তার লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবান্না হতে স্বভাবতই একটু দেরী হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ করে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটের আগে কিন্তু উঠতে হবে, নৈলে সূর্য্যোদয়ের সব সৌন্দর্য্য দেখতে পাবেন না।'

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে কি ? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিগ্যেস করলুম, 'অ্যালার্ম' ঘড়ি আছে কি ?'

মিসেস দাস বললেন, 'না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।'

শ্যালক বললেন, 'কিন্তু আপনার ঘুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি?'

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, 'আমি ঘুমাবো না, এই ক'ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোব আর ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকবেন?

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তাহলে আমিও জেগে থাকি।' আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

আমার মন কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিল না। আমরা দু'জন বয়স্থ ব্যক্তি, ঘুমোব আর এই দুটি যুবক যুবতী সারারাত্রি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঞ্জন করে দিয়ে বললেন, 'তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।'

'আমি বললাম, আমারও ঠিক তাই।'

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রয়িং রুমে বেশ জুৎ করে বসা গেল। চার ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সংগে আরম্ভ হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গল্প চলেছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন; শ্যালক সোফায় লম্বা হয়ে সিগার টানছেন; আমিও একটা গদি মোড়া চেয়ারে গুটিসুটি

হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি ; কেবল প্রমথ অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনও কমিয়ে দিচ্ছে কখনও বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শান্ত চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন ; সিগারের দগ্ধ প্রান্তটুকু এ্যাশ-ট্রের ওপর রেখে বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভয় করে না ?'

মিসেস দাস একটু ভুরু তুলে তাকালেন, 'ভয় ? কিসের ভয় ?'

বাড়ির মাথার ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ করে চলেছে ; আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম 'মনে করুন ভূতের ভয়।'

প্রমথ মিস্টার দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাগ-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার কথা শুনে চকিতে ফিরে চাইল ; তারপর আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বিদ্রূপ করে বলল, 'ভূতের ভয়! সে আবার কি ? ভূত বলে কিছু আছে নাকি ? বরদাবাবুর যত কুসংস্কার।' মিসেস দাসকে জিগ্যেস করলুম, 'আপনারও কি তাই মত ?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত—কি জানি—'

প্রমথ জোর গলায় বলে উঠল, 'ভূত নেই। ভূত শব্দের যে অর্থই ধর, ভূত থাকতে পারে না। আছে শুধু বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই কি যথেষ্ট নয় ?'

তার মুখের পানে তাকালুম ; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ নরম স্বভাবের মানুষ, তাকে এত বিচলিত কখনও দেখিনি। যেন

সাবিত্রীকে একটা কথা বলবার জন্যে তার প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমাদের সামনে বলতে পারছে না।

শ্যালকও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন ; তিনি বললেন, 'বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভূতও থাকতে বাধ্য। আমাদের সকলেরই অতীত জীবন আছে—সেইটেই ভূত। তোমারও ভূত আছে, প্রমথ তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মরা মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, মরা মানুষের সবটাই ভূত ; আমাদের কিছুটা বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভূত কথাটার দু'রকম অর্থ নিয়ে লোফালুফি করছেন, প্রমথ তা বুঝল না ; তার তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুর পর আত্মা যে বেঁচে থাকে তা প্রমাণ করতে পারেন ?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারি না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে বরদা খবর রাখে, ওকে জিগ্যেস কর।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্রমথবাবু, যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না ; আপনিও যদি বিশ্বাস করবেন না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করানো কারুর সাধ্য নয়! তবে এইটুকু বলতে পারি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিভাবান লোক প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেছেন। যথা—উইলিয়াম ক্রুকস, অলিভার লজ, কোনন ডয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। যদি প্রমাণ করতে পারেন, প্রমাণ করুন নৈলে কেবল কতকগুলো বিলিতী নাম আউড়ে আমাকে কাবু করতে পারবেন না।'

একটু রাগ হল। বললুম. 'বেশ। বিশ্বাস করা না করা আপনার

ইচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন, প্ল্যাঞ্চেট করা যাক।'

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'প্ল্যাঞ্চেট। ভূত নামাবেন?'

বললুম, 'প্রমথবাবুর অবিশ্বাস ভাঙবার আর তো কোনও উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় করে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় করবে না।' চকিতে একবার প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, করুন না। আর কিছু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশী কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলেই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘরেই ছিল। আমি তখন দু'চার কথায় প্ল্যাঞ্চেটের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চারজনে টেবিল ঘিরে বসা গেল।

শ্যালক প্রশ্ন করলেন, 'কাকে ডাকা হবে?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছে ডাকা যেতে পারে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমরা সবাই চিনি। অন্ততঃ যার চেহারা আমাদের সকলের জানা আছে।'

আমরা যেখানে বসেছিলুম তার অল্প দূরেই মিস্টার দাসের ছবি দেয়ালে টাঙানো ছিল। প্রমথ বসেছিল ছবির দিকে পিঠ করে, আর মিসেস দাস ছিলেন তার সুমুখে। মিসেস দাস ছবির পানে চোখ তুললেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখও সেই দিকে ফিরল। অল্প আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা স্পষ্ট হয়ে আছে।

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমার পানে চাইলেন। তাঁর চোখের প্রশ্ন বুঝে আমি বলুলম, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকা যাক।

আমি যদিও ওঁকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে মনে ওঁর কথা ভাবুন।'

আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর হাত রাখা হল। তারপর আমরা চোখ বুজে মিস্টার দাসের ধ্যান শুরু করে দিলুম।

প্ল্যাঞ্চেটের টেবিলে যখন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে; মনে হয় টেবিলের মরা কাঠে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার হল না। তখন চোখ খুলে আর সকলের পানে তাকালুম।

প্রমথকে দেখেই বুঝলুম প্রেতের আবির্ভাব হয়েছে, টেবিলের ওপর নয়, মানুষের ওপর। এমন মাঝে মাঝে হয় তার মুখটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে; মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলুম, 'কেউ এসেছেন কি?'

প্রমথ আস্তে আস্তে মুখ তুলল; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসেব দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথর মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ—ক্রুর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথর দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উঁকি মারছে।

মিসেস দাস সম্মোহিতের মতো তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ প্রমথ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী।'

তার গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ

বিস্ফারিত হতে লাগল; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ! তুমি, তুমি!' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাণ্ড বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো; তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে গরজাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই; আমি আর শ্যালক দু'জনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেঁচামেচি শুনে এসে পড়েছিল; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নান ঘরের দিকে: সেখানে তাকে মেঝেয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলুম আর চীৎকার করে বলতে লাগলুম—'আপনি চলে যান—চলে যান—'

'না যাব না—সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্রমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল; হাত-পা ছোঁড়াও বন্ধ হল।

আধঘণ্টা পরে দু'জনে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজ বিজ করে বকছে—'দেব না—দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রয়িং রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্ঞান হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল। বরদাবাবু, এ কী হল?'

মেয়েদের মনের অন্তরতম কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের লজ্জা আর ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্নাই তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস দাসের পাশে বসে তাঁকে যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর চাকরানিদের বললুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগ্গির তৈরি করে নিয়ে এস।'

সেদিন সূর্য্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুই ঘরে দুটি রুগীর পরিচর্য্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করে ঘুম ভাঙাতেও সাহস হল না, আবার হয়তো বিদ্ঘুটে কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নৈলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্য্যন্ত যখন প্রমথর ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। ভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার হর-জটায় বাস করেন, তাকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু আজ এঁর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাতর চক্ষে মিসেস্ দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই

দরকার কিন্তু আমরা না থাকলে আপনার যদি কোন লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস্ দাস বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না।'

বৃদ্ধ ডাক্তার আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে ; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব ; দরকার হলে আমার স্ত্রী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মরমী লোক ; অযথা প্রশ্ন করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই ; ঘুম ভাঙলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরুবার সময় মিসেস্ দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোনও আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর হর-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্ধ্যের সময় খবর পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথ'র সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সংকোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দোর খুলে দাঁড়ালো। তার চেহারায় কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে কট্‌মট্ করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম্ করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সংেগ আমার এই শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলনুম।

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গল্প শুনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃথ্বী প্রশ্ন করিল, 'তোমার গল্প এইখানেই শেষ? না আর কিছু আছে?'

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলনুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন; সাবিত্রীর সংেগ প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সংেগ অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলনুম। কিন্তু দেখলনুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরল ভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিই নি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন

এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেছেন ? কিংবা—আর কি হতে পারে ?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল ? কোথায় গেল সে ?'

অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চীৎকারধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া ঊর্দ্ধে চাহিলাম ; দেখিলাম, বাদুড়ের মতো একটা পাখী চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখীটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

স্বখাত সলিল

যৌবনের দৃঢ় অসন্দিগ্ধ চিত্তবল অন্য বয়সে দেখা যায় না। যৌবনে সমগ্র বস্তুকে হয় ত আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, কিন্তু যেটুকু দেখি খুব স্পষ্টভাবে দেখি। তাই, চল্লিশ পার হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে যখন 'চালশে' ধরে, মনও তখনও স্পষ্ট দেখার নিঃসংশয় দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। হয় ত দৃষ্টি ধোঁয়াটে হওয়ার সঙ্গে দৃষ্টির ক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত হয় ; কিন্তু মোটের উপব একরোখা ভাবে নিজেকেই নির্ভুল মনে করিবার অকুণ্ঠিত সাহস আর থাকে না।

দেবব্রতের কথা যখন মনে পড়িত, তখন ভাবিতাম তাহার বয়সও ত চল্লিশ পার হইয়া গেল ; যৌবনের অদম্য দুঃসাহসিকতায় একদিন সে যাহা করিয়াছিল, আজ কি সেজন্য তাহার অনুশোচনা হয় না ? বিদ্রোহীর রক্ত-রাঙা ঝাণ্ডা কি এখনও সে তেমনি খাড়া রাখিতে পারিয়াছে ?

কারণ, যে দুর্গম পথে সে একাকী যাত্রা সুরু করিয়াছিল, আদর্শের বৈজয়ন্তী কাঁধে লইয়া সে পথে চলা যে কত কঠিন, তাহা ত আর কাহারও অবিদিত নাই। পদে পদে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাদের জট ছাড়াইবার সময় যৌবনের কল্পনা-উদ্ভূত আদর্শ কোনও কাজেই লাগে না।

তারপর দেবব্রতের সঙ্গে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হইয়া গেল। ব্যবসার উপলক্ষে মধ্য-প্রদেশের এক অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র সহরে গিয়েছিলাম। সেখানে যে বাঙ্গালী কেহ থাকিতে পারে, এ সম্ভাবনা আদৌ মনে আসে নাই; ইচ্ছা ছিল ধর্ম্মশালায় দুদিন থাকিয়া কাজ শেষ করিয়া ফিরিব।

ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ীর খোঁজ করিতে গিয়া দেখি, দেবব্রত একখানা চকচকে আট সিলিণ্ডার মোটর হইতে নামিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া গেলাম। তারপর বলিয়া উঠিলাম, 'দেবব্রত! তুমি এখানে?'

দেবব্রত আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে এক লাফে আসিয়া আমাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল—'মন্মথ! তুমি হঠাৎ এখানে? উঃ কতদিন পরে দেখা!' বলিতে বলিতে তাহার গলাটা ভারী হইয়া আসিল।

দেখিলাম তাহার চেহারা বিশেষ বদ্‌লায় নাই, একটু মোটা হইয়াছে; কিন্তু মুখের সেই ধারালো তীক্ষ্ণতা এখনও তেমনি অম্লান আছে। মাথার ছোট-করিয়া-ছাঁটা কোঁকড়া চুল রগের কাছে পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবব্রত আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'কাজে এসেছ নিশ্চয়। কি কাজ পরে শুনব, এখন ক'দিন আছ?'

'দুদিন। কাল সন্ধ্যের গাড়ীতে যেতে হবে।'

'থাকবার কোন আস্তানা নেই ত?'

'ধর্ম্মশালায় থাকব ঠিক আছে।'

'ওসব চালাকি চলবে না, আমার বাড়িতে থাকতে হবে।'

আমার স্যুটকেসটা হাত হইতে কাড়িয়া মোটরে রাখিয়া আসিল, তারপর সপ্রশ্ননেত্রে আমার পানে তাকাইল।

আমি বলিলাম, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কি? আপত্তি আছে?'

মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, 'না—চল।'

দেবব্রত আমার হাতটা চাপিয়া প্রায় গুঁড়া করিয়া দিবার উপক্রম করিল, তারপর বলিল, 'তুমি গাড়ীতে বস। আমি পার্শেল অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে আসি, একটা পার্শেল আসবার কথা আছে।'

গাড়ীতে গিয়ে বসিলাম। দেবব্রতের মনের ভিতর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আগে তাহার একটা স্বাতন্ত্র্যের ভাব ছিল, যেন নিজেকে দূরে দূরে রাখিত, এখন সেটা নাই। বোধ হয় বয়সের গুণ। ভাবিতে লাগিলাম, বয়সের গুণে আমারও কি এমনি অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয় ত হইয়াছে, নচেৎ এত সহজে তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম কি করিয়া? আর এক দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন তাহার সহিত এক ট্যাক্সিতে যাইতে সম্মত হই নাই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে দেবব্রত ফিরিয়া আসিল, তাহার সংগে একজন কুলী একটা মাঝারি গোছের বাস্কেট মাথায় করিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

দেবব্রত নিজেই গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল, কুলীকে বিদায় করিয়া গাড়ীতে স্টার্ট দিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। ক্ষুদ্র গলিবহুল সহরের ভিতর দিয়া দেবব্রত সাবধানে গাড়ী চালাইয়া লইয়া চলিল। আমি কি সম্ভাষণ করিব কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সহরের ঘিঞ্জি অংশ পার হইয়া দেবব্রত জোরে মোটর চালাইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। মনে হইল, আমাকে পাইয়া সে অকৃত্রিম ভাবে খুশী হইয়াছে। হাসিতে এই আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল।

কি বলিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে বাজে প্রশ্ন করিলাম, 'বাস্কেটে কি আছে?'

'গলদা চিংড়ি। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আনাই। ভালই হ'ল, ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে।' বলিয়া আবার স্নিগ্ধচোখে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করছ তা হ'লে?'

'হ্যাঁ। সহর থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একখানা বাড়ি কিনে আছি।'

'কলকাতার বাস তুলে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এখানে আছ?'

'বার বছর। কেয়ার বয়স।'

চমকিয়া তাহার দিকে চাহিলাম।

সে সহজভাবে বলিল, 'কেয়া আমার বড় মেয়ে, তার বয়স এই বার চলেছে।'

বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। বড় মেয়ের বয়স বার। হয় ত আরও সন্তানাদি হইয়াছে। তাহার স্ত্রী—, অনেকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

দেবব্রতের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলাম। পাঁচিল-ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে ভিলা-জাতীয় বাড়ি; আশেপাশেও ঐ রকম বাগানযুক্ত বাড়ি রহিয়াছে। বুঝিলাম, এটি সৌখীন ধনী ব্যক্তিদের পাড়া।

দেবব্রত আমাকে একটা সুসজ্জিত ঘরে বসাইয়া ভিতরে প্রস্থান করিল ; কিয়ৎকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল, 'তোমার কাজ কি খুব জরুরী ? এখনই বেরুতে হবে ?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ। খেয়ে দেয়ে বেলা বারটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।'

পর্দ্দা সরাইয়া একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। চমকিয়া মুখ তুলিয়াই চিনিতে পারিলাম ; ষোল বছর আগে একবার মাত্র রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিয়াছিলাম, তবু চিনিতে কষ্ট হইল না। পরিধানে সাধারণ শাড়ী শেমিজ, সিঁথিতে সিন্দূর জ্বল জ্বল করিতেছে। যে বয়সে গৃহিণী, সচিব, সখী, প্রিয় শিষ্যা ও জননীর একই দেহে সম্মিলন হয় এ সেই বয়স ; যৌবনের উদ্দাম বর্ষা আর নাই, নির্ম্মল শারদ স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া তল পর্য্যন্ত দেখা যায়।

সে আমার সম্মুখে অবিচলিত থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। এই লজ্জাকর লজ্জা ঢাকিবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি নত হইয়া আমাকে একটা প্রণাম করিল। আমি বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলাম, 'থাক, থাক।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, 'ভাল আছেন ?' এই কথা দুইটা কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে তাহাকে যে কতখানি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইল, তাহা তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম।

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত একটা 'হ্যাঁ' বলিয়া আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। দেবব্রতের উপর রাগ হইতে লাগিল। আমার সম্মুখে এমন ভাবে স্ত্রীকে টানিয়া আনিবার কি দরকার ছিল ? আমি কে ? দুদিনের অতিথি বৈ ত নয়। কিন্তু তবু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেব-

ব্রতের পক্ষে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক, সে যে কোন অবস্থাতেই পর্দা-প্রথা মানিবে, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর।

দেবব্রত এতক্ষণ জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, এবার ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিল, 'মন্মথ খেয়ে দেয়ে কাজে বেরুবে—ওর জন্যে—'

বাড়ির গৃহিণী যেন এতক্ষণে নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল; তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম মিথ্যা কুণ্ঠার কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'রান্না তৈরী আছে। উনি নেয়ে নিন। তুমিও নেয়ে নাও না, এক সঙ্গে বসে খাবে।' বলিয়া ক্ষিপ্রচরণে আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

স্নানাদি সারিয়া এক সঙ্গে আহারে বসিলাম। পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিল, দেবব্রতের স্ত্রী দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়াইল। দেবব্রত হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল, স্ত্রীকে আমার জন্য এটা-ওটা আনিয়া জোর করিয়া খাওয়াইবার উপদেশ দিল। তাহাদের কথায় আচরণে কোথাও একটু কুণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তবু আমি নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিলাম না। মনের ভিতরটা আড়ষ্ট ও অস্বচ্ছন্দ হইয়া রহিল।

কাজ সারিয়া ফিরিতে বেলা সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেল।

বারান্দার উপর দেবব্রত দাঁড়াইয়া আছে; তাহার পাশে তাহার একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া একটি মেয়ে।

দেবব্রত বলিল, 'আমার মেয়ে কেয়া।—কেয়া, এঁকে প্রণাম কর।'

বাপের উগ্র সৌন্দর্য্যের সহিত মায়ের কোমল লাবণ্য মিশিয়া কেয়ার রূপ হইয়াছে অপরূপ! এখনও যৌবন বহুদূরে, কচি মেয়ের মুখের একটি অচপল শান্তশ্রী মনকে মুগ্ধ করে।

কেয়া আমাকে প্রণাম করিল ; আমি বলিলাম, 'তোমাকে আজ সকালে দেখিনি কেন ?'

হাস্যোজ্জ্বল চোখে কেয়া বলিল, 'আমরা ইস্কুলে গিয়েছিলুম।'

তারপর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে দেখিলাম, একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে ভীরু মৃগশিশুর মত দূর হইতে আমাকে দেখিতেছে। সারঙ্গচক্ষুর মত বিস্ফারিত কালো চোখ দুটিতে অসীম কৌতূহল ; কিন্তু সে কাছে আসিতেছে না, একবার এ দরজা একবার ও দরজা হইতে উঁকি মারিতেছে।

আমি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম, সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কেয়া বাপের চেয়ারের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, 'মণ্টুর বড্ড লজ্জা, নতুন মানুষ দেখলে ও কিছুতেই কাছ আসে না ! না বাবা ?'

মণ্টুর চেহারায় মায়ের ছাপ বসান, কাজেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। দেবব্রত 'মণ্টু এদিকে আয়' বলিয়া দু'বার ডাকিল, কিন্তু মণ্টুর সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘরের তৈয়ারী রসগোল্লায় কামড় দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে ?' কথাটা এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

দেবব্রত বলিল, 'এই দুটি।'

নীরবে জলযোগ শেষ করিলাম।

রুমালে মুখ মুছিতেছি, শুনিতে পাইলাম কেয়া তাহার বাপের কানে কানে বলিতেছে, 'বাবা, ইনি আমাদের কে হন ?'

দেবব্রত বলিল,, উনি তোমাদের বাবার বন্ধু হন ?'

কেয়া একটু নিরাশ হইল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, 'ওঁকে আমি কি বলে ডাকব?'

দেবব্রত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলে ডাকতে তুমি চাও?'

কেয়া একবার চকিতে আমার দিকে তাকাইয়া বাপের গলা জড়াইয়া কানে কানে কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু দেবব্রতের মুখের যে পরিবর্ত্তন হইল তাহা দেখিতে পাইলাম। সে একবার মাথা নাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাকে বলিল, 'তুমি বিশ্রাম কর, আমি একবার বাজারটা ঘুরে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার এই হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে কেয়া একটু আহত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আমিও তাহাদের চুপি চুপি কথাবার্ত্তায় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, কেয়াকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি ইস্কুলে কি পড়?'

কেয়া বলিল, 'বাংলা আর সংস্কৃত।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ইংরিজি পড় না?'

'না, মা ইংরিজি পড়া ভালবাসেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, শেষে বলিলাম, 'সংস্কৃত কি পড়?'

'ব্যাকরণ আর কাব্য।'

'কোন্‌ কাব্য?'

'কুমারসম্ভব।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'কুমারসম্ভব বুঝতে পার?'

কেয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। যেখানে বুঝতে পারি না, পণ্ডিতজী বুঝিয়ে দেন!'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুমারসম্ভবের কোন্‌ সর্গ সব চেয়ে ভাল লাগে?'

কেয়া উৎসাহে দুই করতল যুক্ত করিয়া উজ্জ্বল চোখে বলিল, 'সপ্তম সর্গ—যেখানে উমার সংগে মহাদেবের বিয়ে হ'ল।'

'আর, পার্ব্বতীর তপস্যা ভাল লাগে না ?'

'হ্যাঁ, তাও খুব ভাল লাগে।' তারপর আমার চেয়ারের হাতলে বসিয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, মহাদেব পার্ব্বতীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন বলুন ত ?'

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'বোধহয় পার্ব্বতীকে কষ্ট দেবার লোভ মহাদেব সামলাতে পারেন নি।'

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কেয়া বলিল, 'যাঃ—তা কেন হবে ?'

'তবে ?'

মুখ গম্ভীর করিয়া সে বলিল, 'কষ্ট না পেলে মহাদেবের মত বর পাওয়া যায় না, তাই।'

কেয়ার মত মেয়ে দেখি নাই। বার বছর বয়স, কিন্তু মনটি তপোবন-কন্যার মত। বুঝিলাম কথাগুলা তাহার নিজের নয়। তাহার কোঁকড়া নরম চুলে হাত বুলাইয়া বলিলাম, 'ও—তাই হবে বোধ হয়।'

হঠাৎ কেয়া বলিল. 'আচ্ছা. আপনি এতদিন আসেন নি কেন ?'

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শেষে বলিলাম, 'তোমাকে ত জানতুম না, তাই আসি নি।'

'বাবাকে, যাকে ত জানতেন, তবে আসেন নি কেন ?'

কঠিন প্রশ্ন, এড়াইয়া গেলাম। বলিলাম, 'আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হয়েছ ?'

মাথাটি হেলাইয়া সে বলিল, 'হ্যাঁ, খুব খুশী হয়েছি। আমাদের বাড়িতে কক্খনো কেউ আসেন না, আমরাও কোথাও যেতে পাই না।

আমার ইস্কুলের বন্ধু রূপকুমারী ছুটি হ'লে মামার বাড়ী যায়—' কেয়ার কণ্ঠ ম্রিয়মাণ হইয়া আসিল—'মা বলছিলেন কালই আপনি চলে যাবেন। আবার কবে আসবেন?'

আমি সহসা কেয়ার মুখ কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেয়া, তখন তোমার বাবার কানে কানে কি বলছিলে? আমাকে কি বলে তুমি ডাকতে চাও?'

কেয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, 'সে—সে কিছু না—' তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'ঐ মণ্টু উঁকি মারছে! ওকে ধরে নিয়ে আসি, দাঁড়ান! একবার ভাব হয়ে গেলে ওর আর লজ্জা থাকে না।'

কেয়া মণ্টুর পিছনে ছুটিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিল না। বোধ হয় কেয়া মণ্টুকে ধরিতে পারে নাই।

রাত্রে আমি শয্যা আশ্রয় করিলে দেবব্রত খাটের পাশে একটা ইজি-চেয়ার টানিয়া বসিল। আলোটা ঘরের কোণে আবছায়া ভাবে জ্বলিতেছিল; এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে আমরা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম।

শেষে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকেই যাওয়া ঠিক তা হ'লে? আর দু'দিন থাকতে পারবে না?'

বলিলাম, 'না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি, গিন্নীরও শরীরটা ভাল নয়।—কেন বল দেখি?'

'তোমাকে পেয়ে কেয়া আর মণ্টু ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তুমি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কথা নেই। ওদের জীবনে এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা কি না!'

আবার দীর্ঘকাল দু'জনে নীরব রহিলাম।

তারপর আমি বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই হয়। তোমারও হয়েছে।'

'আমার? কি জানি—'

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, 'তুমি কলিকাতার বাস তুলে দিলে কেন? এখানে ত বাঙালীর মুখ দেখতে পাও না।'

'কেন, বুঝতে পারছ না?'

'ছেলে-মেয়ের জন্যে?'

'হ্যাঁ। ওদের দোষ কি? ওরা কেন শাস্তি পাবে?'

'কিন্তু এখানে লুকিয়ে থেকে কি ওদের বাঁচাতে পারবে? সমাজ বড় কঠোর, বড় ছিদ্রান্বেষী।'

'তা জানি বলেই ত এই স্বজাতিহীন বিদেশে লুকিয়ে থেকে সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। সমাজ আমাদের প্রতি অন্যায় পীড়ন করতে চায়, আমি তা করতে দেব না।'

'সমাজ অন্যায় পীড়ন করতে চায় একথা তুমি কি করে বল?'

'পুরানো তর্কে দরকার নেই। কিন্তু বাপ-মায়ের কল্পিত অপরাধ সন্তানের ঘাড়ে চাপানোটাও সুবিচার নয়।'

আমি প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার ছেলেবেলার মতগুলো এখনো বদলায় নি?'

'কিছু বদলেছে, সব বদলায় নি।'

'বিবাহ সম্বন্ধে?'

'বিশেষ বদলায় নি। বিবাহের একটা লৌকিক উপকারিতা আছে।

কিন্তু তবু বলব, বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন। যেখানে প্রেম আছে সেখানে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, যেখানে তা নেই, সেখানে বিবাহ একটা বীভৎস পাশবিকতা।'

একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করি সে নিজে কেন বিবাহ করিয়াছিল। প্রশ্ন অরুচিকর হইলেও সে সোজা উত্তর দিবে জানিতাম, কারণ দেবব্রতের মনে কোথাও ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তাহাকে আঘাত করিতে সংকোচ বোধ হইল।

বলিলাম, 'ঘুম পাচ্ছে এবার শোও গে।'

দেবব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিল, 'দ্বিজুরায়ের একটা হাসির গান আছে, 'তারেই বলে প্রেম'। গানটা হাসির নয়, অত্যন্ত করুণ। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষ একলা থাকতে পারে না; তাই সমাজ যত অবিচারই করুক, তাকে নিয়ে কারবার করতে হয়। আমি সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি; তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই; আমি আজ পর্যন্ত জেনে বুঝে কোনও অন্যায় কাজ করি নি; আর কাউকে করতেও বলি নি। নিজের কাছে আমি খাঁটি আছি। এখন কথা হচ্ছে, যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি তারা আমায় সাহায্য করবে কি না।'

শেষ কথাটার মধ্যে যে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিল তাহা আমার কানে বাজিল। কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না। দেবব্রত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় একটা কিছু প্রত্যাশা করিল। তারপর 'ঘুমোও' বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ইহার পর অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না; দেবব্রতের কথাগুলা মনের মধ্যে ওলট-পালট করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে কেয়ার শিশু-মুখ ও মণ্টুর হরিণ-চোখ দৃষ্টিপটের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে হইল, দেবব্রতের স্ত্রী যে গৃহত্যাগিনী একথা আমি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে আর কে জানে ?

সকাল বেলা মণ্টু নিজে আসিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তখনও শয্যাত্যাগ করি নাই, সে মুখখানি অতিশয় করুণ করিয়া নিজের একটি আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'কেটে গেছে।'

আমি উঠিয়া বসিয়া আঙুল পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এতই আণুবীক্ষণিক যে চোখে দেখা গেল না। বলিলাম, 'তাই ত, বড্ড লেগেছে। এস, জলপটি বেঁধে দিই।'

পটি বাঁধা হইলে মণ্টু বলিল, 'আমার একটা কোকিল আছে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'তাই না কি! কৈ আমাকে দেখালে না ?'

মণ্টু জানালার বাহিরে একটা গাছের দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ গাছে বসে রোজ ডাকে, আবার উড়ে যায়। ওটা আমার কোকিল। দিদির কোকিল নেই।'

বনের পাখীর উপর এমন অবাধ স্বত্বাধিকার প্রচার করিতে দেখিয়া আমি থতমত খাইয়া গেলাম, বলিলাম, 'তোমার আর কি আছে ?'

অত্যন্ত রহস্যপূর্ণভাবে মণ্টু পকেট হইতে একটি ফলাভাঙা ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল, প্রশ্ন করিল, 'তোমার ছুরি আছে ?'

বিষণ্ণ ভাবে বলিলাম, 'না। তোমার ছুরিটা আমায় দেবে ?'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া মণ্টু বলিল, 'না। তোমাকে একটা লাট্টু দেব।'

'কিন্তু আমি যে লাট্টু ঘোরাতে জানি না।'

'আমি শিখিয়ে দেব।'

এইরূপ আলাপ আলোচনার মধ্যে সে ধীরে ধীরে আমার কোলের

কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন আমার জানুর উপর উপবেশন করিয়া এক প্রচণ্ড প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'তুমি আমার, না দিদির ?'

কোকিলের মত আমাকেও নিশ্চয় মণ্টু ইতিমধ্যে নিজের খাস-সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে, মহা দ্বিধায় পড়িয়া গিয়া বলিলাম, 'তাই ত, একথা ত ভেবে দেখি নি। দু'জনেরই হওয়া কি চলে না ?'

এমন সময় মণ্টুর দিদি আসিয়া প্রবেশ করিল। মণ্টু লাফাইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না তুমি আমার, দিদির নয়—দিদির নয়।'

দিদিও ছাড়িবার পাত্রী নয়, পিছন হইতে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কক্‌খনো না। তুই কাল কেন আসিস নি, উনি আমার।'

এ বিবাদের মীমাংসা সহজে হইত না, কিন্তু এই সময় তাহাদের মা দরজার পরদা সরাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'ও কি হচ্ছে ! ছেড়ে দে, ওঁকে জ্বালাতন করিস নি। আপনি চা খাবেন আসুন।'

হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত পূর্ণতা লইয়া চা খাইতে গেলাম।

তারপর যতক্ষণ বাড়িতে রহিলাম, মণ্টু ও কেয়া আমার সঙ্গ ছাড়িল না ; আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্কুলেও গেল না। আমাকে লইয়া তাহাদের শিশুচিত্তের এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সমারোহ যেন আমারও মনে নেশা জাগাইয়া তুলিল।

কাজে বাহির হইতে বেলা একটা বাজিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। কাজ শেষ হইল না ; কিন্তু সে যাক্।

সন্ধ্যার ট্রেণে যাইব। তার আগে যতটুকু সময় পাইলাম কেয়া ও মণ্টুর সঙ্গেই কাটাইলাম। দেবব্রত আমার ইচ্ছা বুঝিয়া আলগোছে রহিল।

ক্রমে যাবার সময় উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া দেবব্রতকে বলিলাম,

'আমি একবার অণিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি ব'স।' দেবব্রত চকিতভাবে আমার দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। কেয়া ও মণ্টু আগে হইতেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেবব্রত নিজে গাড়ী চালাইয়া লইয়া চলিল। আমার গলাটা এমন বুজিয়া গিয়াছিল যে, প্রথম খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। একটি কৃতজ্ঞ নতজানু নারীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

মণ্টু ও কেয়া আমার পাশ ঘেঁসিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। স্টেশনে পেঁছিতে যখন আর দেরী নাই, তখন কেয়া চুপিচুপি আমার পকেটে হাত দিয়া কি রাখিয়া দিল। জিনিষটি বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি ছোট্ট রুমাল, কোণে লাল রেশমী সূতায় কেয়ার নাম লেখা। আমি কেয়ার মাথা টানিয়া আনিয়া কপালে চুম্বন করিলাম।

মণ্টু ম্লানমুখে একটি রং-চটা প্রাচীন লাট্টু আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। আমি তাহাদের দু'জনের মুখ কাছে আনিয়া বলিলাম, 'আমি তোমাদের কে জান? আমি তোমাদের মামা।'

একটু অবিশ্বাস ও অনেকখানি আনন্দ চোখে ভরিয়া দু'জনে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'সত্যি, তোমাদের মা জানেন। তিনি আমার বোন হন; বাড়ি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আর, এবার ছুটি হ'লে তোমরাও রূপকুমারীর মত মামার বাড়ি যাবে।'

ট্রেণ ছাড়িলে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেবব্রতকে বলিলাম, 'মাসখানেকের মধ্যে আবার আসছি। কাজটা শেষ হ'ল না।'

দেবব্রত বুঝিল। বাষ্পোজ্জ্বল চোখে একবার ঘাড় নাড়িল।

অভিজ্ঞান

বাড়ির পিছনে লম্বা খোলা চাতালের উপর ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলাম। ঠিক নীচে দিয়া ভাদ্রের গঙ্গা অধীর উন্মাদনায় ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিছুদূরে আর একটি চেয়ারে যে বসিয়াছিল, তাহার নাম সুনন্দা। সুনন্দার বয়স, আঠারো-উনিশ ; তাহাকে দেখিলে সম্মুখে ঐ ভরা গঙ্গার কথা মনে হয়, তেমনই অধীর উদ্বেল। প্রবল চুম্বকের মত তাহার যৌবনোচ্ছল দেহের একটা অনিবার্য্য আকর্ষণ আছে ; বুদ্ধি ও সংযমকে অতি সহজে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে।

সুনন্দার ঘন কালো চুলের মধ্যে সিঁদূর নাই ; বোধ হয় সে অনূঢ়া। তাহার কানে সূক্ষ্ম তারের কাজ করা সোনার কানবালা, গলায় সরু একটি হার ; পরিধানে মেঘলা রঙের শাড়ী। বর্ত্তমানে সে সাগ্রহে আমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল ; তাহার ঘোর রক্তবর্ণ পুরন্ত অধরোষ্ঠ যেন অনুচ্চারিত প্রশ্নে ঈষৎ বিভক্ত হইয়া ছিল।

কিন্তু এই ভাদ্রের অপরাহ্ণে, সুনন্দার পাশে বসিয়াও আমার মনটা ছটফট করিতেছিল। একটা দুর্ব্বোধ্য অশান্তি স্নায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেহটাকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

সুনন্দা সহসা প্রশ্ন করিল, বলুন না, আপনার নাম কি ?

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, বলতে পারি না।

অধীর অসন্তোষে সুনন্দার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, বলবেন না, তাই বলুন। কেন, নাম বললে কি আমরা আপনাকে বাড়ি

থেকে বিদেয় করে দেব ? আর, এখন ত আপনি সেরে উঠেছেন, বিদেয় করলেই বা ক্ষতি কি ?

আমি বলিলাম, সুনন্দা, আমি চলে যেতেই চাই ।

সুনন্দা অধর দংশন করিল ; একটু থামিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, রাগ করলেন ? আমি অমন যা-তা বলি ।

রাগ করি নি—সত্যি বলছি । যতদিন বিছানায় শুয়েছিলুম, কিছু মনে হয় নি । কিন্তু এখন আর আমার মন টিকছে না, কেবলি মনে হচ্ছে কোথাও চলে যাই । আমার যেন কোথাও যাবার আছে ।

কোথায় যাবার আছে ?

তা জানি না ।

ভৎর্সনার সুরে সুনন্দা বলিল, আচ্ছা, কেন মিছে কথা বললেন ? বলুন না, কারুর জন্যে আপনার মন কেমন করছে তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান । হয় ত আপনার স্ত্রী ।

চমকিয়া উঠিলাম, স্ত্রী ? আমার কি বিয়ে হয়েছে ?

সুনন্দা তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, হয় নি ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, না—বোধহয় ।

সুনন্দা বিদ্যুতের মত প্রশ্ন করিল, তবে ও হীরের দুল কার ?

হীরের দুল ?

সুনন্দা হাসিয়া উঠিল । তাহার হাসিতে একটু তিক্ত-রস ছিল ; বলিল, তাও অস্বীকার করবেন ? আচ্ছা, আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি ?

ধীরে ধীরে বলিলাম, মনে করি, আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন দেব আজি আনিলে দিবা, তোমার পরশ অমৃত সরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা !—কথাগুলা একরকম নিঃসাড়েই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল ।

সুনন্দা গংগার দিকে তাকাইল ; তাহার চোখে ভরা-নদীর ছায়া পড়িল। গংগার পরপারে মেঘলা আকাশ চিরিয়া এক ঝলক রক্তাভ সূর্য্য-রশ্মি তাহার কপালে, গালে, সুগোল সবল বাহুতে আসিয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল পরে সে চটুল হাসিয়া মুখ ফিরাইল, আমার পরশ যে অমৃত সরস তা জানলেন কি করে ?

জ্বরের ঘোরে যখন অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলুম, তখন কপালে তোমার ঠাণ্ডা হাত বড় মিষ্টি লাগত।

সুনন্দা, শূন্যের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তিন দিন জ্বরে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। উঃ—সে কি জ্বর ! গায়ে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ডাক্তার বললেন, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে ; আমরা ত ভেবেছিলুম—, কিন্তু কি ভাগ্যি চার দিনের দিন থেকে জ্বর কমতে আরম্ভ করল !

আমার কি হয়েছিল সুনন্দা ? জ্বরই বা হ'ল কেন আবার সেরেই বা উঠলুম কি করে ?

সে একবার আমার দিকে তাকাইয়া পূর্ব্ববৎ আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, আমি রোজ সকালে এইখানে স্নান করি। বারো দিন আগে সকালবেলা নাইতে এসে দেখি স্রোতে আপনি ভেসে যাচ্ছেন। সাঁতরে গিয়ে তুলে নিয়ে এলুম। অজ্ঞান অচৈতন্য, নিশ্বাস এত আস্তে পড়ছে যে ধরা যায় না। শুধু প্রাণপণে একটা ভাংগা গাছের ডাল আঁকড়ে আছেন।

ডাকাডাকি করাতে বাবা এলেন, চাকর-বাকরেরা এল। ধরাধরি করে আপনাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালুম। তার আধঘণ্টা পরেই তাড়স দিয়ে জ্বর এল।

গভীর মনঃসংযোগে শুনিয়া বলিলাম, তারপর ?

সুনন্দা ঈষৎ হাসিল—তারপর আর কি ! এখন সেরে উঠেছেন, তাই পরিচয় না দিয়েই পালাবার চেষ্টা করছেন ।

আমি কাতরভাবে বলিলাম, সুনন্দা, আমার যদি উপায় থাকত—

ভ্রূভঙ্গি করিয়া সুনন্দা বলিল, উপায় নেই কেন ? আপনার নামে কি পুলিশের ওয়ারেণ্ট আছে ?

এই সময় সুনন্দার বাবা আসিয়া একটা শূন্য চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার নাম জানি না ; সুনন্দা বাবা বলে, চাকরেরা সসম্ভ্রমে 'বাবুজী, বলিয়া ডাকে ; যে ডাক্তার আমার চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহাকে একবার 'রায় বাহাদুর' বলিতে শুনিয়াছি । অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, বেশী কথা কহেন না ; যে যা বলে তাহাতেই রাজি । তিনি নিঃশব্দে চেয়ারে আসিয়া বসিলে সুনন্দা বলিল, বাবা, উনি চলে যেতে চান । কিন্তু নামধাম ঠিকানা কিছুই বলবেন না ।

কর্ত্তা নিস্তেজভাবে বলিলেন, চলে যাবেন ? কিন্তু এখনো ওঁর শরীর তেমন—আরো দুদিন থেকে গেলে হয় ত—

সুনন্দা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু উনি নাম বলবেন না কেন ? আমি ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছি, আমাকে বলতে কি বাধা ?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে কর্ত্তা বলিলেন, উনি যখন বলতে চান না তখন আমাদের পীড়াপীড়ি করা উচিত নয় । হয় ত কোন কারণ আছে ।

সুনন্দা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ উজ্জ্বল চোখে আমাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, বেশ দরকার নেই বলবার, আমি চাই না শুনতে । বলিয়া দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল ।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম, তারপর কর্ত্তা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কবে যেতে চান ?

আমি সন্ধ্যা-ধূসর গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিলাম, আজ থাক। কাল সকালে।

আচ্ছা। আপনার যাতে সুবিধা হয়।

সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। দুর্ব্বলের গভীর নিদ্রা, কিন্তু ভাঙিয়া গেল। কপালে অতি শীতল মধুর স্পর্শ অনুভব করিয়া চোখ মেলিলাম। সুনন্দা শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। অপরিসীম তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গেল; আবার চক্ষু মুদিলাম।

প্রভাতে বিদায় কালে বলিলাম, সুনন্দা, তা হ'লে এবার যাই।

সুনন্দা বলিল, এই নিন, এই মনিব্যাগটা আপনার পকেটে ছিল। ওর মধ্যে আড়াই শ' টাকার নোট আছে। আর, দুটো হীরের দুল।

আচ্ছা, বলিয়া মনিব্যাগ পকেটে পুরিলাম।

সুনন্দার বাবা ঘরে ছিলেন না। সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মনে থাকবে ত?

হ্যাঁ।

আবার আসবেন ত?

কি জানি—

তীব্র চাপা স্বরে সুনন্দা বলিল, আসবেন। আসতে হবে। আমি পথ চেয়ে থাকব।

দেখিলাম তাহার চোখ দুটি বাষ্পোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে একবার দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিল তারপর বিদায় হাসি হাসিল।

বাড়ির গাড়ী ষ্টেশনে পেঁছাইয়া দিল।

ষ্টেশনটি মাঝারি, বেশী লোকজন নাই। টিকিট ঘরের খাঁচার মুখে গিয়া একটি দশ টাকার নোট ছিদ্রপথে বাড়াইয়া দিলাম, বলিলাম, টিকিট।

ঝিমানো স্বরে টিকিটবাবু বলিলেন, কোথায় যাবেন?

কোথায় যাইব? এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলাম, দশ টাকায় কতদূর যাওয়া যায়?

টিকিটবাবু চক্ষু মেলিয়া পিঞ্জরের মধ্যে হইতে চাহিলেন, শেষে বলিলেন, কোন দিকে যেতে চান?

তাচ্ছিল্যভরে কহিলাম, যে দিকে হয়।

টিকিটবাবু আর একবার আমাকে দৃষ্টি-প্রসাদে অভিষিক্ত করিয়া নীরবে একটি টিকিট কাটিয়া ছিদ্রপথে আগাইয়া দিলেন।

লাল টিকিট; রংটা কেমন যেন পছন্দ হইল না, অনভ্যস্ত ঠেকিল। বলিলাম, লাল টিকিট দিলেন কেন?

তবে কোন টিকিট দেব, হলদে?

চিন্তা করিয়া বলিলাম, না থাক। এতেই হবে?

টিকিটবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া আমি সে স্থান ছাড়িয়া প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন আসিল। একটা খালি কামরা দেখিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

ট্রেন চলিয়াছে। চারিদিকে জল-ভরা ধানের ক্ষেত। আকাশে কখনও মেঘ কখনও রৌদ্র। আমি কোথায় চলিয়াছি? এ পৃথিবীতে

আমাকে চেনে এমন কেহ আছে কি ? আমার কি গৃহ আছে ? কোথায় কাহার কাছে যাইবার জন্য আমার মনে এই অধীর চঞ্চলতা ?

ট্রেন চলিতেছে, থামিতেছে ; যাত্রীরা উঠিতেছে নামিতেছে, চেঁচামেচি হট্টগোল করিতেছে। ইহাদের মুখে রাগ বিরাগ ক্রোধ আনন্দের প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে, নির্লিপ্তভাবে দেখিতেছি। সুনন্দার বিদায়কালীন মুখ মাঝে মাঝে মনে পড়িতেছে।

সুনন্দা বোধ হয় আমাকে ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি কুলপ্লাবী ভাদ্রের গঙ্গার মত, আপন অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্যে অসম্বৃত। আমাকে সে গঙ্গা হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল, আমি তাহার কুড়াইয়া পাওয়া জিনিষ। গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম কেন ?

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। খবরের কাগজ বিক্রয় হইতেছিল ; একটা কিনিলাম। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল, নিরুৎসুকভাবে কাগজখানা চোখের সম্মুখে ধরিয়া রহিলাম।

কিছুদিন আগে ট্রেনে কলিশন হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ, কত লোক মারা গিয়াছে, কত লোককে পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের নাম ধাম ঠিকানা। দেশ হইতে সোনা রপ্তানী হইতেছে। এবৎসর ধানের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার পূর্ব্বাভাস। এসব খবর ছাপিয়া কি লাভ হয় ? কাহার কাজে লাগে ?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। আমি যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী, আমার যাত্রার শেষ নাই।

এ কি ! রবি ! তুমি !

একটা জনাকীর্ণ বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, একজন লোক মুখ ব্যাদিত করিয়া আমার পানে তাকাইয়া আছে —তাহার চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিবে।

আমিও তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমারই সমবয়সী—লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, নাকের পাশে একটা পিঙ্গলবর্ণ মাথা, চোয়াল ভারী, নাক উঁচু। বলবান মজবুত গোছের লোক।

সে একলাফে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া আমার কাঁধ ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, রবি, তুমি বেঁচে আছ! উঃ—আমরা ভেবেছিলুম—

আমি নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলাম, আপনাকে আমি চিনি না।

চেন না? সে আবার ব্যাদিত মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ বন্ধ করিল। তাহার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়িল!

আমি ভদ্রতা করিয়া পাশে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, বসুন। সে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার দৃষ্টি আমার মুখ হইতে নড়িল না।

আমাকে সত্যিই চিনতে পারছ না?

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলাম, না, আপনি কে?

সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিল, আমি নীরোদ—ডাক্তার নীরোদ রায়, তোমার বাল্যবন্ধু; অরুণা সম্পর্কে আমার বোন হয়—, তারপর অধীর কণ্ঠে বলিল, কি আশ্চর্য্য রবি, আমাকে ভুলে গেলে! এই যে মাসখানেক আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে!

বলতে পারি না।

সে হঠাৎ বলিল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তাহার চোখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছে দেখিলাম।

বলিলাম, জানি না।

কোথা থেকে আসছ?

একটু ভাবিয়া বলিলাম, জানি না।

সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, রবি, তোমার কি কিছু মনে নেই? ট্রেনের কলিশন—তুমি কলিকাতা থেকে ফিরছিলে—রাত্রি তিনটের সময় কলিশন হয়—কিছু মনে করতে পারছ না?

না।—আমার নাম কি রবি?

এই সময় ট্রেনের ঘণ্টা বাজিল।

সে একটা সংকল্প ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমার সঙ্গে এস। এখানে আমার বাড়ী, আমার কাছেই থাকবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কাছে থাকব কেন?

সে ছেলে ভুলানো স্বরে বলিল, পরে বলব, তোমার সঙ্গে অনেক মজার কথা আছে। এখন এস। এবার গাড়ী ছাড়বে।

তাহার বালকোচিত প্রতারণার চেষ্টা দেখিয়া হাসি পাইল, বলিলাম, আপনার কি বিশ্বাস আমি পাগল?

না না—তা নয়, এস গাড়ী ছাড়ছে। বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল।

ষ্টেশনের ফটকে টিকিট বাহির করিলাম; সে হাত হইতে টিকিটখানা লুফিয়া লইল—টিকিট করেছ দেখছি। টিকিট পরীক্ষা করিয়া বলিল, রামপুর থেকে আসছ?

তা হবে।

কিন্তু যেখানে কলিশন হয়েছিল, সেখান থেকে রামপুর ত প্রায় সত্তর মাইল দূরে। যাহোক—এস।

আমি কহিলাম, আমি আবার কিন্তু কালই চলে যাব।

ষ্টেশনের বাইরে একখানা ছোট মটর ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ডাক্তার নীরোদ চালাইয়া লইয়া চলিল।

একটা লাল রঙের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। দেখিলাম লেখা আছে—'টেলিগ্রাফ অফিস'। ডাক্তার বলিল তুমি বোস, আমি এখনি আসছি। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মিনিট তিন চার পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার নীরবে গাড়ী হাঁকাইয়া লইয়া চলিল।

৩

নীরোদ ডাক্তারের বাড়ির একটা ঘরে বসিয়া ছিলাম। ডাক্তার আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রামপুরে ক'দিন ছিলে?

শুনেছি বারো দিন।

কি ক'রে সেখানে গেলে মনে আছে কি?

না। শুনেছি—গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলুম, সুনন্দা তুলেছিল।

ও—ডাক্তার কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, সুনন্দা কে?

একটি মেয়ে।

তোমার যা যা মনে আছে সব আমাকে বল।

সংক্ষেপে বলিলাম। শুনিয়া ডাক্তার বলিল, হুঁ—এখন সব বুঝতে পারছি।

কি বুঝতে পারছেন?

তোমার যা হয়েছিল।

কি হয়েছিল?

ডাক্তার ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথা গুণিয়া গুণিয়া বলিতে লাগিল,

তুমি রাত্রির ট্রেনে কলিকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলে, পথে কলিশন হয়, তুমি সম্ভবত সেই ধাক্কায় গাড়ী থেকে ছিটকে বাইরে পড়েছিলে। মাথায় চোট লেগেছিল; অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গায় পড়ে যাও। গঙ্গা সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে। তারপর ভাসতে ভাসতে রামপুরে পেঁছে ছিলে, কেমন—এখন মনে পড়ছে কি না?

আমি ক্লান্ত ভাবে বলিলাম, না। আমি কিন্তু কাল সকালেই চলে যেতে চাই।

কোথায় যাবে?

মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম, রামপুরে সুনন্দার কাছে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু মুখে বলিলাম, জানি না।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে—ডাক্তার উঠিয়া ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হঠাৎ বলিল, অরুণা কাল আসবে।

ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলাম, অরুণা কে?

চেন না?

না। স্ত্রীলোক?

ডাক্তার হতাশপূর্ণস্বরে বলিল, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক।

আমি মাথা নাড়িলাম, সুনন্দা ছাড়া আমি আর কোন স্ত্রীলোককে চিনি না।

আচ্ছা ওকথা যাক্। এস, এখন অন্য গল্প করি।

কিছুক্ষণ ডাক্তার অন্য গল্প করিল। সে পাঁচ বছর এখানে ডাক্তারি করিতেছে, ইহারই মধ্যে বেশ পশার জমাইয়া তুলিয়াছে। তাহার স্ত্রী পুত্রাদি এখন দেশে আছে, পূজার সময় গিয়া তাহাদের লইয়া আসিবে ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

শেষে ডাক্তার বলিল, আগে তুমি রবি ঠাকুরের কবিতা খুব আবৃত্তি করতে। এখন পার ?

পারি।

বল ত একটা শুনি !

আমি বলিলাম,—

> 'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
> ছুটিনে কাহারো পিছুতে
> মন নাহি মোর কিছুতেই—নাই
> কিছুতে !
> সবলে কারেও ধরিনা বাসনা মুঠিতে
> দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—'

ডাক্তার আশা-ব্যগ্র কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া যেন গল্পচ্ছলে বলিল, সেবার যখন তুমি আর আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে আই এস-সি পড়ি, তখন তুমি একবার এই কবিতাটা আমাদের সাহিত্য সভায় আবৃত্তি করেছিলে—

নিজের কথা আমার কিছু মনে পড়ে না।

ডাক্তার আবার গুম হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন। এতে কি লাভ জানি না, কিন্তু আমার বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

না না, আর ও কথা নয়। ডাক্তার ঘড়ি দেখিয়া বলিল, আটটা বেজে গেছে। চল, এবার দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে ; কাল সকালে ঘুম ভেঙে হয়ত—

হ্যাঁ—কাল সকালেই আমি যাব।

সকালে নটার সময় বলিলাম, এবারে তাহ'লে বিদায় হই।

গভীর উৎকণ্ঠায় ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ডাক্তার বলিল, আর একটু। আধ ঘণ্টা পরে যেও—এখন ত কোন ট্রেন নেই। চল ততক্ষণ ঐ ঘরে বসবে।

মনের সেই অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—ডাক্তারের সাহচর্য্য ভাল লাগিতেছিল না। তবু ঘরে গিয়া বসিলাম, বলিলাম, ঠিক সাড়ে নটার সময় আমি উঠব।

ডাক্তার 'আচ্ছা' বলিয়া আমাকে ঘরে বসাইয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার লোক মন্দ নয়। সে আমাকে আপন করিয়া লইতে চায়, কিন্তু আমি আপন হইতে পারিতেছি না। সুনন্দাও কাছে টানিয়াছিল, আমি কাছে যাইতে পারি নাই।

দশ মিনিট; পনের মিনিট কাটিয়া গেল। বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল। ভালই হইল, ডাক্তারের মোটরেই ষ্টেশনে যাইব।

চাপাকণ্ঠের কথাবার্ত্তা কানে আসিতে লাগিল। হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনি অর্দ্ধপথে রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এবার যাইতে হইবে।

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াছি, একটি স্ত্রীলোক দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার বয়স কুড়ি-একুশ; তন্বী, গৌরাঙ্গী—মুখখানি অতি সুন্দর। কিন্তু চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, রুক্ষ চুলের মাঝখানে খানিকটা অযত্নবিন্যস্ত সিঁদুর। চোখে পাগলের দৃষ্টি।

সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর একটা অর্দ্ধোচ্চারিত—'ওগো' বলিয়া ছিন্নমূল লতার মত আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, আপনি কে ?

সে মুখ তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো তুমি আমায় চিনতে পারছ না ?

স্বরটা মর্ম্মভেদী। কিন্তু আমার প্রাণে কোনও সাড়া জাগিল না, কেবল অন্য কোথাও চলিয়া যাইবার অধীরতা দুর্নিবার হইয়া উঠিল।

বলিলাম, না। আমি এবার যাই।

সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যেও না—যেও না, আমি যে তোমার স্ত্রী—তোমার অরুণা—

তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। স্পর্শটা অত্যন্ত পরিচিত। আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়া গেল, বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বলিলাম, আপনার কান্না দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার আর সময় নেই—আমি যাই। বলিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

ডাক্তার বাহিরে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে বলিলাম, চললুম তবে—বিদায়।

মোটর বারান্দার নীচেই ছিল; তাহাতে উঠিতে যাইব, স্মরণ হইল ডাক্তারকে কিছু দেওয়া হয় নাই।

টাকা বাহির করিবার জন্য মনিব্যাগ খুলিলাম। টাকা ছাড়া আরও দু'একটা জিনিষ রহিয়াছে, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। একটা খাটালের তলদেশে নীল কাগজে মোড়া কি একটা রহিয়াছে। দুই আঙ্গুল দিয়া সেটা বাহির করিলাম। মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম—একজোড়া হীরার দুল।

পৃথিবী ও আকাশ, সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটাই যেন এতক্ষণ একটু হেলিয়া একটু বাঁকিয়া ছিল, এখন নড়িয়া-চড়িয়া নিজের অভ্যস্ত স্থানে বসিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিলাম। পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার আংটি দেখিয়া দুষ্মন্তেরও কি এমনি হইয়াছিল?

ফিরিয়া গেলাম।

ডাক্তারকে বলিলাম, নীরু, যাওয়া হ'ল না। মোটর নিয়ে যেতে বল্।

নিরোদ আমার কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চক্ষে চাহিল,—রবি! মনে পড়েছে?

পড়েছে! ছাড়্ অরুণার কাছে যাই।

আর সুনন্দা?

'সুনন্দা' নামটা যেন কোথায় শুনিয়াছি—স্বপ্নের মত মনে হইল, বলিলাম, সে আবার কে?

নীরোদ হাসিয়া বলিল, কেউ না—এখন ঘরে যা।

ঘরে অরুণা মেজের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল।

তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া কম্পিতস্বরে বলিলাম,—অরুণা, তোমার হীরের দুল এনেছি—ওঠ!

পূর্ণিমা

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল—ফাগুন মাসের পূর্ণিমার চাঁদ; কলিকাতা সহরের অসমতল মস্তকের উপর অজস্র কিরণজাল ঢালিয়া দিতেছিল। এই ফাগুন পূর্ণিমার চাঁদ সামান্য নয়; যুগে যুগে কত কবি ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই মহিমা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সদর রাস্তা ও গলির মোড়ের উপর একটি বাড়ি। তাহার ত্রিতলের একটি ঘরে বাড়ির কর্ত্তা মুরারি চাটুয্যে খাটের উপর হাঁটু তুলিয়া এবং মুখ বিকৃত করিয়া শুইয়া ছিলেন। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে নটা। চাঁদ আকাশের জ্যোৎস্না-পিছল পথে পথে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠিয়াছে।

মুরারি চাটুয্যের হাঁটুর মধ্যে চিড়িক্ মারিতেছিল। তিনিও হঠাৎ চিড়িক্ মারিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, 'গিনি—ওরে গিনি—'

কন্যা হেমাঙ্গিনী আসিয়া দাঁড়াইল।

'কি বাবা?'

চাটুয্যে বলিলেন, 'আমার খাবার ঘরেই দিয়ে যাবি। আজ নামতে পারব না।'

গিনি বলিল, 'বাতের ব্যথা বেড়েছে বুঝি?'

'হুঁ। আর শোন্, কবিরাজি তেল আর একটু আগুন করে নিয়ে আয় সেঁক দিতে হবে।'

গিনি বলিল, 'আচ্ছা। আজ পূর্ণিমা কিনা, তাই বাতের ব্যথা চাগাড় দিয়েছে।'

চাটুয্যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন, 'পূর্ণিমার নিকুচি করেছে।'

গিনি সেঁকের ব্যবস্থা করিতে গেল। তাহার মনে পড়িল, দু'বছর আগে এই ফাগুন পূর্ণিমার রাত্রে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তারপর ছয় মাস কাটিল না, সব ফুরাইয়া গেল। কেবল সুদীর্ঘ শুষ্ক ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিল। গিনির মর্ম্মতল মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ফাগুন পূর্ণিমা!

রান্নাঘরে গিয়া গিনি মালসায় আগুন তুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তাহার দাদা জীবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবুর চেহারা রোগা লম্বা, মাথাটাও লম্বাটে ধরণের, চোখ দুটো জলজলে।

তাহার গায়ে চাদর জড়ানো রহিয়াছে, চাদরের ভিতর দুই হাত বুকের উপর আবদ্ধ।

জীবু বলিল, 'গিনি, আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখিস। আমি বেরুচ্চি—'

গিনির বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল,—'এত রাত্রে বেরুচ্চ!'

'হ্যাঁ'—জীবু চলিয়া গেল।

গিনি শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজ পূর্ণিমা।

বাড়ি হইতে ফুটপাথে নামিয়া জীবু দেখিল, সম্মুখেই চাঁদ। সে বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর আপন মনে চলিতে আরম্ভ করিল। চাদরের মধ্যে হাতের মুঠিতে যে-বস্তুটি শক্ত করিয়া ধরা আছে তাহা যেন হাতের উত্তাপে গরম হইয়া উঠিতেছে।

কিছুদূর চলিয়া জীবু থমকিয়া দাঁড়াইল। ফুটপাথের পাশেই একটা খোলা জানালা, ভিতর হইতে আলো আসিতেছে। জীবু গলা বাড়াইয়া জানালার ভিতর উঁকি মারিল, ডাকিল, 'ও মহী-দা—'

ঘরের মধ্যে একটি লোক টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

'কে, জীবু নাকি? কি খবর হে?'

জীবু বলিল, 'ভারি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, 'চল না মহী-দা, বেড়াতে যাবে।'

মহী বলিল, 'এত রাত্রে বেড়াতে? পাগল নাকি?'

জীবু মিনতি করিয়া বলিল, 'চল না মহী-দা, এমন চাঁদের আলো—'

'আমি যাব না ভাই, তুমি যাও—' বলিয়া মহী জানালা বন্ধ করিয়া

দিল। জলজলে চোখ লইয়া জীবু কিছুক্ষণ বন্ধ জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ঘরের ভিতর মহী আসিয়া আবার টেবিলের সম্মুখে বসিল। জীবুর সহিত রাত্রে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার পাগলামি তাহার নাই বটে, কিন্তু জীবুর কথাগুলা তাহার কানে বাজিতে লাগিল—ভারি সুন্দর চাঁদ উঠেছে···এমন চাঁদের আলো—

মহী একজন কবি। এবং প্রেমিকও বটে। তাহার ত্রিশ বছর বয়স এবং সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও সে বিবাহ করে নাই; কারণ বারেন্দ্র শ্রেণীর হইয়া সে একটি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভালবাসিয়া ছিল।

যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল তাহার কী রূপ—যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জ্যোতি ফাটিয়া পড়ে। পাড়া সম্পর্কে মহী তাহার বাড়িতে যাতায়াত করিত, কদাচ দু' একটা কথাও বলিত; কিন্তু মহী বড় মুখচোরা, তাহার মনের কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় নাই। উশীরের মত তাহার অন্তরের সমস্ত সৌরভ শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং তাহাকে মধ্যম শ্রেণীর একটি কবি করিয়া তুলিয়াছিল।

দুই বছর আগে মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল, তারপর নবোঢ়া বধু স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতে সে বিধবা হইয়া আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।···লোকে বলে বিষকন্যা ঐ রকম হয়, তাহাদের কেহ ভোগ করিতে পারে না···বিষকন্যা কি সত্য —না কবিকল্পনা? যদি কল্পনাই হয় তবে তাহার মধ্যে তীব্র কবিত্বের ঝাঁঝ আছে—

মহীর মাথার মধ্যেও কবিতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে জানালা খুলিয়া একবার বাহিরে তাকাইল। সম্মুখেই পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে—

মহী ফিরিয়া আসিয়া কবিতা লিখিতে বসিল।

—চাঁদের আলোয় তোমারে দেখিনি কভু
মনে হয় তুমি আরও সুন্দর হবে।
বিদ্যুৎ শিখা নবনীপিণ্ড হয়ে
জমাট বাঁধিয়া রবে।

কবিতা যখন শেষ হইল তখন চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে, কলিকাতা সহর নিশুতি।

কিন্তু কবিতা লিখিয়া মহীর হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নাই; তাহার উপর ঘুম চটিয়া গিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল, অনেকদিন গিনিকে দেখিনি···আজ এই চাঁদ্‌নি আলোতে যদি একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়···উন্মনা হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে···আমি রাস্তা থেকে চুপি চুপি দেখে ফিরে আসব···

সম্ভাবনা কম, বুঝিয়াও মহী রাস্তায় বাহির হইল। সে হঠকারী নয়—কিন্তু আজ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—

* * * *

জীবু অনেক রাস্তা ঘুরিয়া আবার নিজের পাড়ায় ফিরিয়াছিল। তাহার মাথার মধ্যে মাদকতার ফেনা গাঁজিয়া উঠিতেছিল। একটা মানুষকে নিরিবিলি পাওয়া যায় না? যতক্ষণ পথে মানুষ ছিল জীবু সতর্কভাবে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও একলা পায় নাই। তাহার বুকের মধ্যে মত্ততা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়াছে; চাদরের আড়ালে মুঠোর ভিতর যে বস্তুটি দৃঢ়বদ্ধ আছে তাহা তপ্ত হইয়া যেন

হাতের তেলো পুড়াইয়া দিতেছে। মহীকে জীবু ডাকিয়াছিল, সে যদি আসিত—

পথ একেবারে নির্জন হইয়া গিয়াছে, দোকান-পাট বন্ধ। নিজের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া জীবু থমকিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের আলোয় একটা মানুষ তাহার বাড়ির সম্মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছে। একটা মানুষ —দ্বিতীয় কেহ নাই। জীবুর চোখদুটা ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

জীবু পাগল। অন্য সময় সে সহজ মানুষ, কিন্তু পূর্ণিমা তিথিতে তাহার সুপ্ত পাগলামি সাপের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, রক্তের মধ্যে হত্যার বীজাণু ছুটাছুটি করে! আজ পূর্ণিমা!

জীবু ছায়া আশ্রয় করিয়া অতি সন্তর্পণে লোকটার দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া চিনিতে পারিল—মহী। মহী তাহার বাড়ীর উল্টা দিকের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছে, তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ। জীবু শ্বাপদের মত দন্ত বাহির করিয়া নিঃশব্দে আরও আগে বাড়িল। মহী এতরাত্রে এখানে কি করিতেছে এ প্রশ্ন তাহার মনে আসিল না। তাহার চিন্তা, শিকার না ফস্কায়!

তারপর চিতা বাঘের মত লাফ দিয়া জীবু মহীর ঘাড়ে পড়িল। তাহার হাতের ছুরিটা একবার জ্যোৎস্নায় চমকিয়া উঠিল, তারপর মহীর গলায় প্রবেশ করিল। মহী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে উদ্‌গলিত রক্ত ফুটপাথের উপর ধারা রচনা করিয়া গড়াইতে লাগিল।

জীবু আর সেখানে দাঁড়াইল না। তাহার মাথার গরম নামিয়া গিয়াছে। সে তীরবেগে ছুটিয়া নিজের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল।

মহীর মৃতদেহ ফুটপাথের উপর সারা রাত্রি পড়িয়া রহিল, কেহ দেখিল না। কেবল আকাশে ফাগুন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে লাগিল।

একূল ওকূল

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধুচরণ যেদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেদিন গাঁয়ের সকলে একবাক্যে বলিল, ইহা যে ঘটিবে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, বরং সাধুচরণ প্রাণের মধ্যে এতখানি বৈরাগ্য পুষিয়া এতদিন সংসার করিল কি করিয়া, ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু সাধুচরণের স্ত্রী সৌদামিনী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

সৌদামিনীর বয়স তখন আটাশ। বড় ছেলে নিমাই সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়াছে; তখনও পাঠশালা ছাড়ে নাই। তাহার নীচে তিনটি বোন। জমিজমা সামান্য যাহা আছে, তাহাতে সাধুচরণের বৈরাগ্যলিপ্ত চিত্ত কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এখন তাহাও ঘুচিয়া গেল। কারণ সংসারের একমাত্র সমর্থ পুরুষ যদি বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহত্যাগ করে, তবে সংসার চলে কি করিয়া?

পাঁচ বৎসর সৌদামিনীর চোখের জল শুকাইল না।

কিন্তু সংসারে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে, দিন কাটিয়া যায়। চাকা-ভাঙ্গা পারিবারিক যন্ত্রটা—যাহা আর কোন দিন চলিবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল—আবার নড়িতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল, সাধুচরণের অভাবে সেটা গুরুতর রকম জখম হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে অচল হয় নাই।

ক্রমে সৌদামিনীর চোখের জলও শুকাইল। জমিদার ভাল লোক, সৌদামিনীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি আর কয়েক বিঘা জমি তাঁহাকে

দিয়াছিলেন, খাজনাও কমাইয়া নামমাত্র রাখিয়াছিলেন। পাড়াগাঁ হইলেও নিঃস্বার্থ লোক দু’ একজন ছিল; তাহারা ক্ষেতখামার দেখিয়া দিত, যাহাতে চাষারা অসহায়া স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে না পারে। মাথায় গুরুভার পড়িলে দেখা যায়, ভারটা যত দুর্ব্বহ মনে করা গিয়াছিল, ততটা নয়। সৌদামিনীরও তাহাই হইল। ক্রমে তিনি নিজেই কাজ চালাইয়া লইতে শিখিলেন। এদিকে নিমাইও বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সাধুচরণের সংসারে তাঁহার শূন্য স্থানটা ভরাট হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রথমা কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ যেদিন স্থির হইয়া গেল, সেদিন সৌদামিনী আবার সেই প্রথম দিনের মত কাঁদিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদিবার অবসর কৈ? চোখ মুছিয়া তাঁহাকে আবার মেয়ের বিবাহের কাজে লাগিতে হইল।

সামান্য ঘরে সামান্য বরে বিবাহ। তবু প্রথম মেয়ের বিবাহ; আয়োজন যথাসাধ্য ভাল করিতে হইল। পাড়ার মোড়ল হারু মুখুজ্যে দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, ‘হ্যাঁ—একলা মেয়েমানুষ, কিন্তু বুকের পাটা আছে বলতে হবে।’ বলিয়া গাঁয়ের অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিদের সংগে গোপনে এই প্রশ্নটাই আলোচনা করিতে চলিলেন যে, সাধুচরণের বৌ নিতান্ত অসহায় হইয়াও এত আয়োজন করিতে সমর্থ হইল কিরূপে।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সমস্যা উঠিল, বর ও বরযাত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা হইবে কোথায়। চণ্ডীমণ্ডপের ঘরটা সাধুচরণের অন্তর্ধানের পর হইতে এ কয় বৎসর সৌদামিনী তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। তাঁহার মনে হয়ত আশা ছিল, সাধুচরণ যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে ঐ ঘর আবার ব্যবহার করিবেন। এখন সৌদামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেই ঘরের চাবি বাহির

করিয়া দিলেন। বলিলেন, ঐ ঘরেই আসর কর্ নিমাই। তাঁর নিজের ঘর ছিল, সব সময় বসে শাস্তর-পুঁথি পড়তেন; ঐ ঘরেই জামাই এসে বসুক। মেয়ে জামায়ের কল্যাণ হবে।' বলিয়া ঘন ঘন চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

যা' হোক, মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সাধুচরণের সাবেক ঘরে কিন্তু আর তালা পড়িল না। নিমাই বড় হইয়াছিল, আঠার উনিশ বছর বয়স। ঘরটা সে ব্যবহার করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর দু'চার জন বন্ধু আসিত, তাহাদের সহিত গল্প-গুজব, লুকাইয়া দু'একটা বিড়ি খাওয়া চলিতে লাগিল।

নিমাই আগে ঘোষেদের বাড়িতে আড্ডা দিতে যাইত; এখন নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে লাগিল দেখিয়া সৌদামিনী চাবি লাগাইবার কথা আর বলিতে পারিলেন না। হাজার হোক, নিমাই এখন বাড়ির কর্ত্তা, বাহিরে একটা ঘর না হইলে তাহার অসুবিধা হয়। তা' ছাড়া এখন জামাই হইয়াছে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হইতে সর্ব্বদা লোকজন আসিতেছে; বাহিরে একটা ঘর না হইলে চলিবে কেন?

সুতরাং বাহিরের যে ঘরটা এতদিন সাধুচরণের শোক-স্মৃতির তাজমহল হইয়া বিরাজ করিতেছিল, তাহা আবার নিত্যব্যবহার্য্য সাধারণ বৈঠক হইয়া পড়িল।

নিমাই ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান্। কুড়ি বছর হইতেই সে নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া লইল। শুধু তাই নয়, নানা বুদ্ধি খাটাইয়া সে জমিজমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একুশ বছর বয়সে সৌদামিনী তাহার বিবাহ দিলেন।

নিমাইয়ের বিবাহের দিনও সৌদামিনী আবার চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু বেশী চোখের জল ফেলিতেও সাহস হইল না, ছেলের অকল্যাণ হইতে পারে। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, 'কপাল! যার ঘর, যার সংসার, সে-ই ভোগ করতে পেলে না!'

ছেলের বিবাহের পর সৌদামিনী ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে অধিক মন দিলেন; গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সাধুচরণ চলিয়া যাইবার পর শাঁখাসিঁদুর রাখিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু হবিষ্য আহার করিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ব্রহ্মচারিণীর কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। এখন বধূর হাতে সংসারের অধিকাংশ কাজ তুলিয়া দিয়া তিনি জপতপের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ছেলে কোনদিন পর হইয়া যাইবে এ ভাবনা তাঁহার ছিল না, তাই বধূর হাতে সংসার ছাড়িয়া দিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না।

তারপর আরও দু' তিন বছর গেল।

সাধুচরণের সন্ন্যাস গ্রহণের পর এগার বছর কাটিয়া গেল। দ্বাদশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকিলে কুশপুত্তলি দাহ করিয়া রীতিমত বৈধব্য আচার গ্রহণ করিতে হয়; পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে এই সব বিধিবিধান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন সাধুচরণ নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

২

কার্ত্তিক মাসের প্রভাত। তখনও ঘাসে ও গাছের পাতায় শিশির শুকায় নাই, পুঁটু সদর দরজায় জলছড়া দিতেছিল, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুঁটুর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'পুঁটু না?'

পুঁটু চমকিয়া মুখ তুলিল। সন্ন্যাসীর গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া আলখাল্লা, মাথায় রুক্ষ চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাঁড়ি, মুখে একটু করুণ

হাসি। তাঁহাকে দেখিয়া পুঁটু হাতের ঘটি নামাইয়া থতমত ভাবে বলিল, 'আপনি কে?'

সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার বাবা।'

সাধুচরণ যখন বিরাগী হইয়া যান, তখন পুঁটুর বয়স ছিল দেড় বছর; কিন্তু সে মায়ের কাছে গল্প শুনিয়া সব কথা জানিত। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সে চীৎকার করিতে করিতে ভিতরের দিকে ছুটিল,—'ওমা—ও মেজদি—কে এসেছে দ্যাখ,—বাবা—বাবা এসেছেন—ওমা—'

মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়িতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সৌদামিনী ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া একেবারে তাঁহার পা জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—'ও গো, এতদিন পরে তুমি ফিরে এলে—'

সাধুচরণের চোখেও জল গড়াইয়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'হাঁ লক্ষ্মী, আমি এসেছি। ওঠ।'

সৌদামিনী পা জড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন, 'আর চলে যাবে না, বল।'

সাধুচরণ বলিলেন, 'না, আর যাব না। সংসার ছেড়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল, লক্ষ্মী। যা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তা' ত পেলুম না। এখন ঘরেই থাকব।'

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক জড় হইয়া গেল। প্রবীণ ব্যক্তিরা সাধুচরণকে আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। হারু মুখুজ্যে বলিলেন, 'সাধুচরণ, তুমি যে ফিরে এসেছ বাবা, এ শুধু তোমার সহধর্ম্মিণী আর ছেলে-মেয়ের পুণ্যে। সন্ন্যাসী হওয়া কি চাট্টিখানি কথা, বাবা, বাপ-পিতামো'র পুণ্যের জোর চাই। এই দ্যাখ না, আমার তিন কুড়ি আট বয়স হল এখনো সংসারে জড়িয়ে আছি! চেষ্টা করলে

কি আমি বৈরাগী হতে পারতুম না? এই ত সেবার জমিদারবাবুকে বলেছিলাম, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের সেবায়েৎ করে দিন, দেখুন সংসার ত্যাগ করতে পারি কি না—ঘরে তৃতীয় পক্ষ আছে ত কি হয়েছে। তা' সে যা' হোক, এখন ফিরে এসেছ, ছেলেপুলে নিয়ে মনের সাধে ঘর সংসার কর, আমরা দেখে চোখ জুড়াই।' উপস্থিত ছেলেবুড়ো সকলেই মুখুজ্যের এই সদিচ্ছার সমর্থন করিল।

নিমাই ক্ষেতখামার পরিদর্শন করিতে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, মাঠে পিতার আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল। জটাজুটধারী বাপকে দেখিয়া সে ক্ষণেক থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তার পর সংকুচিত্ত ভাবে প্রণাম করিল। সাধুচরণ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তার পর কয়েকদিন ধরিয়া সাধুচরণের গৃহে যেন উৎসব লাগিয়া গেল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা চারিদিকে রটিয়া যাইবার পর, আশেপাশের গ্রাম হইতেও পরিচিত-অপরিচিত নানা লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সাধুচরণ এই এগারো বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; সাধু, যোগী, অলৌকিক ব্যাপারও বোধ করি অনেক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন; তাঁহার গল্প সকলে চমৎকৃত হইয়া শুনিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপে লোক ধরে না। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সাধুচরণ বহুজনপরিবৃত হইয়া তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের কাহিনী শুনাইতেছেন। বাড়ির ভিতরেও আনন্দের সীমা নাই। দলে দলে গাঁয়ের মেয়েরা আসিতেছে; সৌদামিনীর চোখে কখনও জল, কখনও হাসি—জপতপও এক প্রকার বন্ধ আছে। বিবাহিতা মেয়ে সাবিত্রী সংবাদ পাইয়া বাপকে দেখিতে আসিয়াছে। দুই অনূঢ়া মেয়ে, কালী ও পুঁটি মুহুর্মুহুঃ বাহিরে গিয়া বাপকে দেখিয়া

আসিতেছে। বিশেষতঃ পুঁটু ত আহ্লাদে ও গর্ব্বে আটখানা, কারণ সে-ই প্রথমে পিতাকে আবিষ্কার করিয়াছে।

মোটের উপর একটা কল্পনাতীত উত্তেজনা ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই পরিবারের সাতটা দিন কাটিয়া গেল।

তার পর ধীরে ধীরে নূতনত্বের জৌলুষ যখন কাটিয়া আসিল, তখন আবার স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার চেষ্টা হইল। সাধুচরণ বাহিরের ঘরটাই অধিকার করিয়া রহিলেন; বাড়ির অন্দরের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। দীর্ঘকাল পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিয়া তাঁহার নূতন অভ্যাস যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি নিজের মধ্যেই রাখিলেন। সন্ন্যাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হোক না হোক, একটা স্বাবলম্বনের ভাব ও বিলাসবিমুখতা জন্মে। সাধুচরণেরও তাহা জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহার আগমনে পরিবারের এক জন লোক বাড়িল বটে, কিন্তু দায়িত্ব বা অসুবিধা কিছু বৃদ্ধি হইল না।

এই ভাবে কার্ত্তিক মাসটা কাটিয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায়, একদিন সন্ধ্যার পর তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখাইয়া সৌদামিনী ছোট মেয়েকে বলিলেন, 'পুঁটু, বাইরে দেখে আয় ত কেউ আছে কি না।'

পুঁটু এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছিল, বলিল, 'না মা, কেউ নেই। বাবা একলা বসে আছেন।'

সৌদামিনী তুলসীমূলে প্রদীপ রাখিয়া, বধূকে রান্না চাপাইবার আদেশ দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। সাধুচরণের সঙ্গে তাঁহার নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগ বড় একটা হয় না, সন্ধ্যাকালে দু'একজন বাহিরের লোক সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে আসিয়া বসে। আজ নিরিবিলি

পাইয়া সৌদামিনী স্বামীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, সাধুচরণ একটা রুক্ষ কম্বল দুই কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন; স্ত্রী প্রবেশ করিলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, 'এস, লক্ষ্মী।'

সৌদামিনী মাদুরের একটা কোণে বসিয়া বলিলেন, 'নিশ্চিন্দি হয়ে তোমার কাছে দু'দণ্ড যে বসব তা' আর হয় না। এখনি হয় ত' কে এসে পড়বে।'

সাধুচরণ বিমনা ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'না, এখন আর কে আসবে! নিমাইকে সন্ধ্যাবেলা দেখি না, সে কোথাও যায় না কি?'

সৌদামিনী কহিলেন, 'সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যের পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করতে যায়। আগে ত এই ঘরেই বসত—' বলিয়া সৌদামিনী থামিয়া গেলেন।

সাধুচরণ অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'আমি এসে ওর বসবার যায়গাটা কেড়ে নিয়েছি—না?'

জিভ কাটিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'সে কি কথা!' তার পর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিমুকে কি কোনো দরকার আছে?'

'না, দরকার এমন কিছু নয়। তবে সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসে বসত, দুটো ধর্ম্মকথা শুনত—এই আর কি।'

পুত্র পিতার কাছে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে, ইহার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকিতে পারে! তবু সৌদামিনীর বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও ছেলেমানুষ, ওর এখন আমোদ আহ্লাদের বয়স, আর ধর্ম্মকথার ও বুঝবেই বা কি!—তার

চেয়ে আমাকেই দুটো ধর্ম্মকথা শোনাও না গো! দেশশুদ্ধ লোক শুনলে, কেবল আমিই শুনতে পেলুম না।'

সাধুচরণ প্রসন্নস্বরে বলিলেন, 'বেশ। কি শুনতে চাও বল।'

সৌদামিনী বিশেষ কিছুই শোনেন নাই, তিনি গোড়া হইতে সব কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন সাধুচরণ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে কোথায় কোথায় গিয়াছেন, বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে কোথায় কোন্ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছেন, কবে কোন্ তীর্থে স্নান করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক গল্প বলিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাও কেমন করিয়া অল্পে অল্পে কমিয়া আসিল, তাহাও গোপন করিলেন না। একবার অসুখে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, 'বুঝতে পারলুম ঘর ছেড়ে এসে ভুল করেছি। সদ্‌গুরুর দর্শন পেলুম না; তা' ছাড়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিঃসম্বল ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার মত বৈরাগ্যের জোরও আমার নেই; তাই শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের কাছেই ফিরে এলুম লক্ষ্মী। ভাবলুম, সাধন ভজনা যা' করবার ঘরে বসেই করব।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'ভগবানের অসীম দয়া।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর সৌদামিনী আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি বলেছিলুম কি, ভগবানের অসীম দয়ায় যখন ঘরে ফিরে এলে, তখন ওই কম্বল-টম্বল ছেড়ে আগেকার মতন—'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'না লক্ষ্মী, ওই কথাটি ব'ল না। এতদিন পরে আর তা' পারব না, অভ্যাস ছেড়ে গেছে।' ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আমি এই বাইরের ঘরটিতে পড়ে থাকব আর দুটি করে খাব। আমাকে আর সংসারে টেন না—মনে ক'রো তোমাদের বাড়িতে একজন অতিথ এসেছে।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন, 'ও আবার কি কথা! তুমিই ত সব। তবে তুমি যদি আবার আগেকার মত হয়ে বসতে পারতে, তা'হলে ছেলের বুকে সাহস হত। হাজার হোক, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়।'

'না লক্ষ্মী, এ বয়সে নতুন করে বিষয় আশয় দেখা আর পেরে উঠব না, তাতে কাজ নেই। তুমি ত জান, চিরদিনই আমি খোলাভোলা লোক। তার চেয়ে নিমাই যেমন করছে করুক, ওর দ্বারাই হবে। দেখেছি, কাজে কর্ম্মে ওর খুব মন আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'তা' আছে। ও-ই ত ক' বছর ধরে সব করছে। এরই মধ্যে ও—'

এই সময় বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। সৌদামিনী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন—হারাণ দত্ত। হারাণ লোকটা নিষ্কর্ম্মা, পরের বৈঠকে আড্ডা দিয়া বেড়ানই তাহার পেশা। সৌদামিনী বিরক্ত হইলেন, গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'খাবার এতক্ষণে তৈরী হ'ল, পুঁটুকে দিয়ে খবর পাঠাব। দেরী ক'রো না যেন।'

'আচ্ছা।—কে, হারাণ না কি? এস হারাণ।'

'আজ্ঞে কর্ত্তা। জমিদার-বাড়ি গিয়েছিলুম, সেখানে শুনে এলুম—'

শুনিতে শুনিতে সৌদামিনী অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

৩

শনিবারে নিমাই সহরে গিয়াছিল।

বেলা একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদির পর আহারে বসিলে সৌদামিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, 'কি হল?'

নিমাই অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া বলিল, 'কাল তা'রা মেয়ে দেখতে আসবে।'

সৌদামিনী উৎসুক স্বরে বলিলেন, 'তার পর, ছেলেটিকে কেমন দেখলি? কালীর সঙ্গে মানাবে ত?'

'বেশ মানাবে। একটু রোগা কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।'

'বয়স কত হবে?'

'হবে উনিশ কুড়ি। এই সবে চাকরিতে ঢুকেছে, এখনো পাকা হয় নি। তার ভগ্নীপতি ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার কি না, তিনিই চেষ্টা ক'রে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুনলুম শীগ্গির চাকরিতে পাকা হবে।'

সৌদামিনী খুশী হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ রে, ছেলের বাপ নেই বুঝি?'

'না, বাপ নেই মা আছে। বড় দুই ভাই আছে, তা'রা কাটা কাপড়ের দোকান করে। তিন ভাই একান্নবর্ত্তী, অবস্থা বেশ ভাল। এই ছেলেটি বংশের মধ্যে বিদ্বান্, এণ্ট্রেন্স পাশ করেছে।'

সৌদামিনী তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, 'বেশ হবে। একটা মেয়ে যদি চাকুরের ঘরে পড়ে ত মন্দ কি? সহরে একজন আপনার লোক রইল। তা হ্যাঁ রে, কি বুঝলি? টাকার কামড় খুব বেশী হবে না কি?'

'এখনও ত দেনা-পাওনার কোনও কথাই হয় নি। দেখা যাক, কি চায়।'

'হ্যাঁ, সে পরের কথা পরে, আগে মেয়ে দেখে পছন্দ ত করুক। কালী অবিশ্যি অপছন্দর মেয়ে নয়—'

অন্যান্য আরও অনেক সাংসারিক কথার পর, আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময় নিমাই বলিল, 'মা, একটা খারাপ খবর আছে।'

শঙ্কিত ভাবে সৌদামিনী বলিলেন, 'কি রে?'

নিমাই গলা খাটো করিয়া বলিল, 'রাধাগোবিন্দ মন্দিরের জন্য জমিদার বাবু একজন ভাল সেবায়েৎ খুঁজছিলেন; বাবার কথা তাঁকে

বলেছিলুম। একরকম ঠিকও হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু মাঝে থেকে একজন গিয়ে তাঁর কাছে চুকলি খেয়েছে।'

সৌদামিনী কিছু জানিতেন না ; নিমাই কথাটা যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিল, মাকে পর্যন্ত বলে নাই। কিন্তু তিনি নিমেষ মধ্যে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, 'তার পর ?'

'তার পর আর কি—ফসকে গেল।—কে চুকলি কেটেছে জান ? ঐ হিংসুটে বুড়ো হারু মুখুজ্যে! ওর নিজের লোভ ছিল কি না।' বলিয়া নিমাই সক্রোধে মুখখানা বিকৃত করিল।

সৌদামিনী ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া কয়েক বার ঘাড় নাড়িলেন। পাড়া-গাঁয়ে কে কিরূপ চরিত্রের লোক সকলেই জানে, অথচ পরস্পরকে দাদা খুড়ো জ্যেঠা বলিয়া মৌখিক আত্মীয়তায় জীবন কাটাইয়া দেয়, ইহাতে নিজেদের কপটতার কথা ভাবিয়া তিল মাত্র লজ্জিত হয় না। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি লাগিয়েছে মুখুজ্যে খুড়ো ?'

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া নিমাই বলিল, 'সে আর শুনে কি হবে! কুচুটে বুড়ো রাজ্যির মিথ্যে কথা লাগিয়েছে।'

'তবু কি বলেছে শুনি না।'

'শুনবে ?—বলেছে বাবা গাঁজাখোর।'

সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, 'কি বলেছে ?'

'বাবা নাকি রোজ রাত্তিরে হারাণ দত্তর সঙ্গে বসে গাঁজা খান। আরো কত কি বলেছে কে জানে। এত বড় মিথ্যেবাদী ঐ বুড়ো—'

আরক্ত মুখে সৌদামিনী বলিলেন, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। মুখুজ্যে খুড়ো নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলে না ? ওর নাতনীকে জাতারে নেয় না কেন ? কেউ জানে না বুঝি!—' বলিয়া তিনি ছেলের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মুখুজ্যের নাতনীর অতি গুহ্য

জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নিমাই এঁটো হাতে দাঁড়াইয়া এই পরম রুচিকর কাহিনী শুনিল, তার পর বলিল, 'হুঁ। ও বুড়োকে আমি ছাড়ব না, মা। কিন্তু এখন গোলমাল করে কাজ নেই, কালীর বিয়েটা আগে ভালয় ভালয় হ'য়ে যাক। তুমি ভেব না, একদিন না একদিন ও-বুড়ো আমার হাতে এসে পড়বেই—তখন—' বলিয়া নিমাই দাওয়ার পাশে মুখ ধুইতে বসিল। পিতাকে গাঁজাখোর বলায় তাহার যত না রাগ হইয়াছিল, এই সূত্রে অমন লাভের চাকরী ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় সে আরও আগুন হইয়া উঠিয়াছিল।

পর দিন দ্বিপ্রহরে সহর হইতে কালীকে দেখিতে আসিল—পাত্র ও তাহার দুই জন বন্ধু। মেয়ে দেখানো হইল। কালী চলনসই মেয়ে; পনের বছর বয়স, বাডন্ত গড়ন। মেয়ে দেখা হইলে পাত্র তাহার এক বন্ধুর কাণে কি বলিল। বন্ধু হাসিমুখে জানাইল, মেয়ে বেশ ভাল, তাহাদের পছন্দ হইয়াছে।

সাধুচরণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তিনি পাত্রটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাত্র বন্ধুদের পানে একবার তাকাইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর দিল। এই সাধুটি যে তাহার সঙ্কল্পিত শ্বশুর, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

জলযোগ শেষ করিয়া পাত্রের দল পুনশ্চ কন্যা সম্বন্ধে তাহাদের পরিতোষ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। বাড়িতে সকলেই হৃষ্ট. সৌদামিনী আড়াল হইতে পাত্রকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার বেশ পছন্দ হইয়াছিল। ছেলেটি একটু রোগা বটে, কিন্তু চট্‌পটে। সহরের ছেলে কি না—কথায় বার্ত্তায় দিব্যি চোস্ত।

সন্ধ্যার সময় সাধুচরণ নিমাইকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে কিয়ৎকাল কথা হইল; তার পর নিমাই ক্ষুব্ধ মুখে বাড়ির

ভিতর গিয়া সৌদামিনীকে বলিল, 'মা, বাবার ছেলে পছন্দ হয় নি, সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বললেন।'

সৌদামিনী তরকারী কুটিতেছিলেন, বঁটি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'সে কি রে!'

'হ্যাঁ—ছেলে নাকি ট্যারা।'

'ট্যারা! কৈ, আমি ত কিছু দেখি নি।'

নিমাই বলিল, 'একটু চোখের দোষ আছে হয়ত, তাকে ট্যারা বলা চলে না।. আর, অত দেখতে গেলে ত ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাবে। ময়ূরছাড়া কার্ত্তিক এখন কোথায় পাওয়া যায় বল।' বলিয়া হতাশ ভাবে হাত উল্টাইয়া প্রস্থান করিল।

সাধুচরণের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে যে জিনিষটি তলে তলে এই পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বুদ্ধিমতী সৌদামিনী জোর করিয়াই চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে-মানুষ চলিয়া যাওয়ায় একদিন সংসার ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলে যে আবার একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তিল তিল করিয়া তাহাই দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তখন সৌদামিনী অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক সুরে বাঁধা সংসারের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাত ধুইয়া তিনি স্বামীর ঘরের অভিমুখে চলিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সৌদামিনী শান্ত স্বরেই বলিলেন, 'হ্যাঁ গা, ছেলে পছন্দ হ'ল না?'

সাধুচরণ কম্বলের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোমার কি রকম মনে হ'ল?'

সৌদামিনী নিজের মতামত প্রকাশ করিতে আসেন নাই, ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার কি মনে হ'ল না-হ'ল তাতে ত কিছু আসে যায় না, আমি মেয়ে-মানুষ। কিন্তু তোমার অপছন্দ হ'ল কেন?'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আর ত কিছু নয়, ছোকরা একটু ট্যারা।'

সৌদামিনী বলিলেন, 'কি জানি বাপু, আমি ত কিছু দেখি নি। আর, তা যদি একটু হয়ই তাতে দোষ কি? আর সব দিক্ দিয়ে ত ভাল।'

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কালীর অমত হবে না?'

'ও আবার কি কথা! কালী গেরস্তর মেয়ে, যে বরে আমরা তা'কে দেব, সেই বর নিয়েই ঘর করতে হবে। আর অপছন্দই বা হবে কেন? ভাল ঘর, লেখাপড়া-জানা ছেলে—একটু চোখের দোষ যদি থাকেই। কাণা-খোঁড়া ত আর নয়।'

অল্প হাসিয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'খোঁড়া বা নুলো হ'লে বরং ভাল ছিল লক্ষ্মী। কিন্তু এ পাত্রের হাতে মেয়ে দিতে আমার মন সরছে না।'

'কেন?' সৌদামিনীর কণ্ঠে একটা অনিচ্ছাকৃত তীব্রতা আসিয়া পড়িল।

সাধুচরণ আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; বোধ হয় নিজের আপত্তিটাকে ভাষায় রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, 'যোগসাধনের কথা তোমাকে ত বোঝাতে পারব না, কিন্তু যে-ছেলে ট্যারা —ভ্রূমধ্যে যার দৃষ্টি স্থির হবার উপায় নেই—তাকে যে ভগবান মেরেছেন। সে যে কোন কালেই ধর্ম্ম'কর্ম্ম' করতে পারবে না।'

সৌদামিনী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। সাধুচরণের

আপত্তির মর্ম্ম হৃদয়ংগম করিতে পারিলেন না বলিয়া নয়, হঠাৎ তাঁহার একটা বিভ্রম জন্মিল। মনে হইল, তাঁহার এই স্বামী তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও তাঁহাদের মনের সাদৃশ্য পর্য্যন্ত নাই, এবং একদিন যে এই লোকটির সংগে নিবিড় দাম্পত্য-বন্ধনের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। অজ্ঞাতসারে তাঁহার একটা হাত মাথার কাপড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

সাধুচরণ বলিলেন, 'ধর্ম্মের অধিকার থেকে স্বয়ং ভগবান্ যাকে বঞ্চিত করেছেন, জ্ঞানতঃ হোক অজ্ঞানতঃ হোক, সে যে মহা পাষণ্ড। জেনেশুনে তাকে জামাই করি কি করে? বুঝছ না?'

সৌদামিনী বুঝিলেন না, বুঝিবার বৃথা চেষ্টাও করিলেন না। তিনি স্বামীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'না, বুঝতে পারলুম না। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কিন্তু ট্যারা হ'লেই যে পাষণ্ড হয় এমন কথা বাপের জন্মে শুনি নি। তা' হলে ওখানে মেয়ের বিয়ে দেবে না? অমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে?'

সাধুচরণ বলিলেন, 'তা আর উপায় কি, বল।'

সৌদামিনী ফিরিয়া দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, 'বেশ, যা' ভাল হয় কর। সাবিত্রীর বিয়ের সময় কিন্তু এসব হাংগাম হয় নি।'

সৌদামিনী দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইবার পর সাধুচরণ তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'কি বলবে বল, আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে।'

সাধুচরণ একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, 'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, সংসারের বড় কিছু বুঝি না; আমার যা' মনে হ'ল বললুম। তোমরা যদি মনে কর ওখানে বিয়ে দিলেই ভাল হবে, তাই দাও। এ সব বিষয়ে

তুমি আর নিমাই আমার চেয়ে ভাল বোঝ, তোমাদের কাজে আমি ঝগড়া বাধিয়ে উৎপাত করতে চাই না।' বলিয়া চক্ষু বুজিয়া আবার কম্বলের উপর দেহ প্রসারিত করিলেন।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, 'তা' আর কি করে হবে। তুমি হলে বাড়ির কর্ত্তা, ভাল হোক, মন্দ হোক, তোমার হুকুমই মেনে চলতে হবে।' বলিয়া অসন্তোষপূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন মুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কালীর বিবাহের কথাটা আপাততঃ ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নানা খুঁটিনাটির ভিতর দিয়া সংসারে অসন্তোষ ও চিত্তক্ষোভ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। সাধুচরণের সেবাযত্ন লইয়াও একটু আধটু ত্রুটি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বাড়িতে একমাত্র পুঁটু তাহার বাবার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। সে ছেলেমানুষ, সাংসারিক ভালমন্দের জ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করে নাই বলিয়াই বোধ করি সে নিরপেক্ষ রহিয়া গিয়াছিল।

বেলা এগারোটার সময় পুঁটু বাহির হইতে আসিয়া বলিল, 'মা, বাবার চান হয়ে গেছে, ভাত বাড়ো।' বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা আসন পাতিতে প্রবৃত্ত হইল।

সৌদামিনী বলিলেন, 'আসন তুলে রাখ পুঁটু, এখন ভাত নামেনি।'

'ভাত নামেনি!' পুঁটু সোজা হইয়া বলিল, 'বা রে! বাবা চান করে বসে থাকবেন! কখন তোমাদের বলে গেছি—'

সৌদামিনী ধমক দিয়া বলিলেন, 'তুই থাম। যা' বলছি কর,

ভাঁড়ার থেকে দুটো বাতাসা আর এক ঘটি জল এখন দিয়ে আয়। ভাত নামতে দেরী হবে।'

পুঁটু রাগিয়া বলিল, 'কেন দেরী হবে! বাবার জন্যে একটু আগে ভাত চড়াতে পার না?'

'পুঁটি!'

'বুঝেছি গো বুঝেছি। দাদার মাঠ থেকে ফিরতে দেরী হয় তাই বেলা করে ভাত চড়ানো। দাদাই সব আর বাবা কেউ নয়।' পুঁটুর ক্রুদ্ধ দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কথাটা সত্য। ধান কাটা চলিতেছিল, তাই প্রত্যহ নিমাইয়ের ফিরিতে দেরী হইত। সে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া ঠাণ্ডা ভাত খাইবে, এই বিবেচনায় সৌদামিনী বিলম্বে রান্না চড়াইতেছিলেন। পুঁটির সত্য কথায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোনো কথা বলিবার পূর্বেই পুঁটি দুপ্ দুপ্ করিয়া পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল। সৌদামিনী অন্ধকার মুখ করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে একটা হৈ চৈ ও কান্নার শব্দ উঠিল।

বাড়িশুদ্ধ লোক ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল কৈবর্ত্ত বিধু হাজরা সাধুচরণের পা দুটা ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে এবং সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া সাধুচরণ পা দুটির আশা ছাড়িয়া দিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। গণেশ বাড়ির একমাত্র ভৃত্য; সে সাধুচরণের বিপদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিধু হাজরাকে সরাইয়া আনিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন বিধু, কি বলবে কর্ত্তাবাবুকে স্পষ্ট করে বল না।'

বিধু হাজরার ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইল না, তাহার কাঁচা-পাকা দাড়ি বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তবু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে সে

বলিল, 'গরীবের মুখের গেরাস কর্ত্তা! ঐ দেড় বিঘা জমির ওপরেই সারা বছরের ভরসা। আপনি সাধু সন্ন্যিসি লোক তাই আপনার পায়েই ছুটে এলুম; আপনি না রক্ষে করলে গরীবকে আর কেউ রক্ষে করতে পারবে না।'

সাধুচরণ বিপন্নভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তখন অনেক যত্নে অনেক সওয়াল করিয়া কথাটা বিধু হাজরার নিকট হইতে উদ্ধার হইল। নিমাইয়ের জমির আলে বিধু হাজরার জমি; বিধু অন্যান্য বারের মত এবারও জমি চাষ-আবাদ করিয়াছে। কিন্তু ধান কাটিতে গিয়া দেখিল নিমাইবাবু তাহার ধান কাটিয়া লইতেছেন। বিধু ওজোর করায় নিমাইবাবু বলিয়াছেন যে, জমি তাঁহার, তিনি নীলামে উহা খরিদ করিয়াছেন। বিধুর জমি অবশ্য কানাই মণ্ডলের কাছে বন্ধক ছিল; কিন্তু কবে যে কানাই মণ্ডল মোকদ্দমা করিয়াছে এবং তার পর আদালতের ডিক্রির জোরে জমি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, বিধু কিছুই জানে না। সে নিশ্চিন্ত মনে জমি চাষ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ধান রোপাই হইবার বহু পূর্ব্বে জমি নিমাইবাবুর দখলে চলিয়া গিয়াছিল। এখন ধান পাকিয়াছে দেখিয়া তিনি জোর করিয়া ধান কাটিয়া লইতেছেন।

ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ংগম করিয়া সাধুচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পাড়াগাঁয়ে এরূপ ঘটনা বিরল নয়। গরীব মূর্খ চাষা মহাজনের নিকট জমি বাঁধা দিয়া টাকা ধার করে। তারপর কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া যায়। হঠাৎ একদিন চাষা দেখে আদালতের ডিগ্রী জারি হইয়াছে, এমন কি আর একজন আসিয়া দখল লইয়া বসিয়া আছে—অথচ সে কিছুই জানে না। সে যখন জানিতে পারে তখন হাহাকার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না।

বিধু আবার সাধুচরণের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'মরে যাব কর্ত্তা, সগুষ্ঠি না খেতে পেয়ে মরে যাবে। ঐ দেড় বিঘেই ভরসা, আর কোথাও এককাঠা জমি নেই—গাঁ শুদ্ধ লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি আমার বাপতুল্যি, নিমাই দাদা আমার বাপের ঠাকুর—আপনারা গরীবকে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবেন না।'

এই সময় নিমাই মাঠ হইতে ফিরিল। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে একবার তাকাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, সাধুচরণ তাহাকে ডাকিলেন। নিমাই মুখ কালো করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিধু যা বলছে তা সত্যি? তুমি ওর জমি নীলামে খরিদ করে নিয়েছ?'

সংক্ষেপে নিমাই বলিল, 'হ্যাঁ।'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'কাজটা ওকে জানিয়ে করলেই ভাল হত না কি?'

নিমাই বলিল, 'যার জমি মহাজনের কাছে বন্ধক আছে, সে নিজে খোঁজ রাখে না কেন? আমি ত লুকিয়ে কিনি নি, সদর নীলেমে কিনেছি।'

সাধুচরণ ব্যথিত স্বরে বলিলেন, 'সে কথা ঠিক, নিমাই। কিন্তু জমি যখন দখল করলে তখনও কি ওকে জানান তোমার উচিত ছিল না? ও গরীব মানুষ, খরচপত্র করে পরিশ্রম করে ধান উবজেছে, সেই ধান তুমি কেটে নিচ্ছ—'

অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে নিমাই বলিয়া উঠিল, 'কে বলে ও ধান উবজেছে! আনুক দেখি একজন সাক্ষী। বলিয়া আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিল; সকলেই জানিত কে ধান উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও হইল না।

হতাশ স্বরে সাধুচরণ বলিলেন, সাক্ষীসাবুদ হয়ত বিধু আনতে পারবে না, কিন্তু সত্যি ও-ই ত জমি চাষ করেছে। জমি যদি তোমারই হয়, তবু যখন চাষ করেছে তখন অন্ততঃ অর্দ্ধেক ধান ত ওর প্রাপ্য—'

'আমি পারব না! জমি আমার, আমি চাষ করেছি। বিধুর ক্ষমতা থাকে আদালত থেকে ধান আদায় করে নিক্।' বলিয়া নিমাই আর বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার জন্য দাঁড়াইল না, ক্রোধবিকৃত মুখে দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

* * * * *

রেলের ইঞ্জিনের মত ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিয়া এতদিনে এই পরিবারের ঘটনাবলী হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সেদিন মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার ঘটিল, তাহার পরদিন হাটবার। গণেশ ভৃত্য বাড়ির কাজ সারিয়া হাটে যাইবার জন্য সৌদামিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে হাট বসে, সপ্তাহে একবার করিয়া সেখান হইতে সংসারের বাজার-হাট, প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া আনা হয়।

সৌদামিনী বাজারের পয়সা গণেশকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে-ছিলেন, গণেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'মা—'

'কি রে—' বলিয়া সৌদামিনী ফিরিলেন।

গণেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'মা, আর চার আনা পয়সা চাই।'

সৌদামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'আর চার আনা পয়সা! কি হবে?'

লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'বড়বাবু বললেন, হাট থেকে চার আনার গাঁজা কিনে আনতে।'

সৌদামিনী যেন পাথর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি

হইল না। তারপর সভয়ে একবার চারিদিকে তাকাইয়া আঁচল হইতে চার আনা পয়সা গণেশের হাতে ফেলিয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে নিজের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন ; গণেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। লজ্জায় ও ধিক্কারে তাঁহার সমস্ত অন্তর ছি ছি করিতে লাগিল।

সেদিন সৌদামিনী আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না, শরীর অসুস্থ বলিয়া মেঝেয় একটা কম্বলের উপর পড়িয়া রহিলেন। রাত্রেও জলস্পর্শ করিলেন না। কালী ও পুঁটু তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিত ; তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে, রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহিরে স্বামীর ঘরে গেলেন।

সাধুচরণ তখন কম্বলের উপর যোগাসনে বসিয়া ছিলেন ; রক্তনেত্র মেলিয়া চাহিলেন।

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সৌদামিনী একবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, ঘরে কেহ নাই। তখন তিনি দুইবার নিশ্বাস টানিয়া তিক্ত চাপা স্বরে বলিলেন, 'মুখুজ্যে খুড়ো তা' হলে মিথ্যে বলে নি!'

সাধুচরণের মৌতাত তখন জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বলেছে মুখুজ্যে খুড়ো ?'

'যা বলেছে তা সত্যি। বলেছে তুমি গাঁজা খাও।'

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সাধুচরণ বলিলেন, 'হ্যাঁ, খাই! গাঁজা খেলে সাধনমার্গের সুবিধে হয়।' বলিয়া ফিক করিয়া হাসিলেন।

সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিলেন,—'পোড়া 'কপাল তোমার সাধন মার্গের। ও কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না! আর, সাধন করতে যদি চাও তবে ঘরে ফিরে এলে কেন ?—উঃ, আমার সোনার সংসার দু' দিনে উচ্ছন্ন গেল!'

সাধুচরণ ঈষৎ গরম হইয়া বলিলেন, 'উচ্ছন্ন গেল কেন ?'

'কেন! তুমি এই কথা জিজ্ঞেস করছ! মেয়ের অমন চমৎকার সম্বন্ধ তুমি ভেঙে দিলে। ছেলে ঠাকুরমন্দিরে চাকরি যোগাড় করে দিলে, তাও তোমার গাঁজা খাওয়ার জন্যে ভেস্তে গেল। তার পর আবার জমিজমা নিয়ে ছেলের পেছনে লেগেছ, কোথাকার কে বিধু হাজরা, তার হয়ে ছেলের সংগে লড়াই করছ। এখন আবার চাকর-বাকরকে দিয়ে গাঁজা আনিয়ে সদরে গাঁজা খাওয়া আরম্ভ করলে! উচ্ছন্ন যাওয়া আর কাকে বলে শুনি!'

সাধুচরণ হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'বেশ করি গাঁজা খাই, আমার খুসী আমি খাব। এ সংসার কার? জমিজমা ঘরবাড়ি কার? আমার! আমি যা' ইচ্ছে করব।'

সৌদামিনীর দুই চক্ষে আগুন ছুটিতে লাগিল, তীব্র অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'চেঁচিও না অত—সবাই ঘুমুচ্ছে। জমিজমা ঘরবাড়ি একদিন তোমার ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই। জমিদারী শেরেস্তায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবে। এখন নিমাই মালিক, সে-ই এ বাড়ির কর্ত্তা; তোমার উৎপাত করবার কোনো অধিকার নেই—বুঝলে?'

ভ্রূমধ্যে অকস্মাৎ হাতুড়ির ঘা খাইয়া যেন সাধুচরণের নেশা ছুটিয়া গেল। সৌদামিনীর এ রকম চেহারা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; তিনি ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর মূঢ়ের মত বলিলেন, 'আমার কোনো অধিকার নেই!'

'না, নেই। এই কথাটা ভাল করে বুঝে নাও। তোমার ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া বৃত্তি এ বাড়িতে চলবে না। এই আমি শেষ কথা বলে গেলুম।' বলিয়া জ্বলন্ত মশালের মত সৌদামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * *

অল্পমাত্র ভোর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও কাক-কোকিল ডাকে নাই, এমন সময় সৌদামিনীর ঘরের দরজায় মৃদু টোকা পড়িল। সৌদামিনীর চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সাধুচরণ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গায়ে সেই প্রথম দিনের আলখাল্লা, কাঁধে কম্বল, বগলে সেই পুরাতন ঝুলি।

সৌদামিনীকে হাতের ইসারায় একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে সাধুচরণ বলিলেন, 'লক্ষ্মী, আমি যাচ্ছি।'

সৌদামিনীর কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, 'যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ লক্ষ্মী, সংসারে আর আমার মন টিকছে না।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সৌদামিনী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার কথায় রাগ করে কি তুমি চলে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'না, সে জন্যে নয়। কিন্তু তোমার কথা সত্যি। সংসারে আমার অধিকার নেই।' একটু থামিয়া বলিলেন, 'প্রথম যেদিন সংসার ছেড়ে গিয়েছিলুম, সেদিন ভুল করেছিলুম; আবার যেদিন ফিরে এলুম, সেদিন তার চেয়ে বড় ভুল করলুম। ভুলে ভুলেই জীবনটা কেটে গেল, সত্যিকার পথ চিনে নিতে পারলুম না।—ললাট-লিখন।'

সৌদামিনীর নিকট হইতে কোনও জবাব আসিল না। সাধুচরণ তখন ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের একটা কম্বল নিয়েছি, বোধ হয় সেজন্যে কোনও অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, তা' হলে চললুম লক্ষ্মী, আর দেরী করব না। অন্ধকার থাকতে থাকতে গ্রাম পেরিয়ে যেতে চাই।'

সাধুচরণ তবু একটু ইতস্তত: করিলেন, হয়ত সৌদামিনীর নিকট

হইতে একটা মৌখিক বাধানিষেধও প্রত্যাশা করিলেন। তার পর উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া নিরাশ্রয় আত্মীয়হীন পৃথিবীর পথে পা বাড়াইলেন। যাইবার সময় খোলা দরজা দিয়া পুঁটুর ঘুমন্ত মুখখানি একবার সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া লইলেন।

সৌদামিনী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা 'না' বলিয়াও তিনি স্বামীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

* * * * *

তখন রোদ উঠিয়াছে। শয়ন-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সৌদামিনী ভারী গলায় সদ্যোত্থিতা বধূকে বলিলেন, 'বৌমা, পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও, নিমু আজ সহরে যাবে।' বধূর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, 'কালীর জন্যে যে পাত্রটি দেখা হয়েছিল তা'দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করতে হবে ত। সামনেই আবার পৌষ মাস।'

মন্দ লোক

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, নীতিবাগীশ বৃদ্ধ ও স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য এ কাহিনী লিখিত হয় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পাতা উল্টাইয়া যাইবেন। কারণ, অযথা রিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কুড়ি বৎসর আগে আমার বয়স কুড়ি বৎসর ছিল। হিসাবে বর্ত্তমান বয়সের যে অঙ্কটা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ছ্যাবলামির পক্ষে অনুকূল নয়। সিদ্ধার্থ এ বয়সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন; নেপোলিয়ন এ বয়সে অর্দ্ধেক য়ুরোপের অধীশ্বর; আলেকজাণ্ডার এতদূর অগ্রসর

হইতেই পারেন নাই, তৎপূর্ব্বেই পৃথিবী জয় শেষ করিয়া ফৌৎ হইয়াছেন। সুতরাং যাহা বলিতেছি তাহা বালসুলভ চপলতা নয়। কেহ দন্ত বাহির করিয়া হাসিবেন না।

কুড়ি বৎসর বয়সেই আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিতে পসার জমাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণ হয়ত রাগ করিতেছেন, কিন্তু আমি জানি ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবান—পসার এবং পত্নী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত; পৌরুষ বা বিদ্যার বলে তাহাদের সংগ্রহ করা যায় না। যদি যাইত, পি. সি. ও বি. সি. রায় অদ্যাপি অনূঢ় কেন?

আরম্ভে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নাম করিয়া গল্পটাকে শোধন করিয়া লইলাম, সংকোচও অনেকটা কাটিয়াছে। অতএব এবার সুরু করিতে পারি।

ছোট একটি শহরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখনও বিবাহ করি নাই; ছোট একটি বাসায় একাকী থাকিতাম, স্বপাক আহার করিতাম এবং 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্ব ফলত সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতাম। সকাল বিকাল আমার ছোট ঘরটি নানা জাতীয় রোগীতে ভরিয়া যাইত; অধিকাংশই গরীব, রোগের লক্ষণ বলিয়া অল্প মূল্যে ঔষধ কিনিয়া লইয়া যাইত। কদাচিৎ দুই একটি সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ি হইতে ডাক পাইতাম। মোটের উপর ভালভাবেই চলিতেছিল; টাকা যত না হউক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

একদিন সকালবেলা রোগীর ভিড় হাল্কা হইয়া গেলে লক্ষ্য করিলাম ঘরের কোণে একটি স্ত্রীলোক একখানা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ঘর যখন একেবারে খালি হইয়া গেল তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জোড়হাতে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল।

সপ্রশ্ন চক্ষে তাহার পানে চাহিলাম। অধিকাংশ রোগীই আমার

পরিচিত, কিন্তু ইহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। বয়স বোধ করি বছর চল্লিশ, থলথলে মোটা গড়ন; মুখের বর্ণ এককালে ফরসা ছিল, এখন মেছেতা পড়িয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। চিবুকের উপর অস্পষ্ট উল্কির দাগ, একটা কানের গহনা পরিবার ছিদ্র ছিঁড়িয়া দুইফাঁক হইয়া আছে। চোখে অসহায় উৎকণ্ঠার চাপা ব্যগ্র দৃষ্টি।

ও দৃষ্টি আমি চিনি। ঘরে যখন তিল-তিল করিয়া প্রিয়জনের মৃত্যু হইতেছে অথচ হাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবারও পয়সা নাই তখন মানুষের চোখে ওই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি পাতিহাঁসের মত ভাঙ্গা গলায় বলিল, 'বাবু আমি মন্দ লোক।' তাহার দুই চোখে বিনীত দীনতা প্রকাশ পাইল।

একটু অবাক হইয়া গেলাম। নিজের সম্বন্ধে এতটা স্পষ্টবাদিতা ত সচরাচর দেখা যায় না। সত্যকাম ও জবালার কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারি নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আমার চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া হেঁটমুখে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের যে পরিচয় দিল তাহাতে সমস্ত দেহ সংকুচিত হইয়া উঠিলেও বুঝিতে বাকি রহিল না—জবালাই বটে।

সঙ্কোচ ও সংস্কার কাটাইয়া উঠা সহজ কথা নয়, এ জাতীয় রোগিণী আমার নাতিদীর্ঘ ডাক্তার-জীবনে এই প্রথম। তবু আমি ডাক্তার, নিজের দায়িত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে ডাক্তারের চলে না। গলার স্বর ঈষৎ কড়া হইয়া গেলেও শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি চাও?'

স্ত্রীলোকটি তখন উৎসাহ পাইয়া ভাঙা গলায় একগঙ্গা কথা বলিয়া গেল। উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতার আতিশয্যে অনেক আবল-তাবল বকিল। তাহার কথার নির্য্যাস এই—

পাপ-ব্যবসায়ের একমাত্র মুনফা একটি কন্যা লইয়া সে যৌবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টাকাকড়ি কিছু রাখিতে পারে নাই, দুই-চারিখানা গহনা যাহা ছিল তাহারই সাহায্যে কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডী তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। কন্যাটির বয়ক্রম এখন ত্রয়োদশ বৎসর ; গত এক বৎসর ধরিয়া সে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছে। শহরের সকল ডাক্তারই একে একে চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির গহনা সব ফুরাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারেরাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আমি ভরসা।

বিবৃতির শেষে স্ত্রীলোকটি ব্যাকুলভাবে বলিল, 'বাবু, আমার আর কিচ্ছু নেই। নিজে দেখতে পাই না, সে যাক—কিন্তু রোগা মেয়েটাকে খেতে দিতে পারি না। আমরা মন্দ লোক, কেউ আমাদের পানে মুখ তুলে চায় না। আপনি দয়া করুন, ভগবান আপনার ভাল করবেন।' বলিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ভগবানের ভাল করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যদিও আমার খুব উচ্চ ধারণা নাই, তবু কেন জানি না, এই ঘৃণিতা নারীটার প্রতি দয়া হইল। বিশেষত যে রোগীকে শহরসুদ্ধ ডাক্তার জবাব দিয়াছে তাহাকে যদি বাঁচাইয়া তুলিতে পারি—

নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার প্রলোভন ছোট বড় অনেক নৈতিক ও লৌকিক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। আমি বিনা পারিশ্রমিকে মেয়েটার চিকিৎসা করিতে সম্মত হইলাম। এমন কি, গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।

কুৎসিৎ পল্লীর কুৎসিততম প্রান্তে একটা খোলার ঘর। দৈন্য যে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহা একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ

থাকে না। কতকগুলা ছেঁড়া কাঁথা ও চটের মধ্যে মেয়েটা পড়িয়া আছে ; কাঠির মত সরু হাত পা, গলাটি নখে ছিঁড়িয়া আনা যায়। গায়ের চামড়া কুঁচকাইয়া চামচিকার মত হইয়া গিয়াছে—চর্ম্মাবৃত কংকাল বলিলেই হয়। যথার্থ বয়স জানা না থাকিলে নয় দশ বছরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইত।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কঠিন রোগ—ম্যরাসমাস, তাহার উপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। যেরূপ অবস্থায় পেঁছিয়াছে তাহাতে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আমার মুখে চোখে বোধ হয় মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, মেয়েটা রোগ-বিষাক্ত অচঞ্চল সর্পচক্ষু মেলিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ও পথ্যের জন্য একটা টাকা স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইতে লাগিল টাকা ও পরিশ্রম দুইই জলে পড়িল।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি রোজ আসে। কখনও ঔষধ, কখনও নির্গুণ বড়ি দিই ; মাঝে মাঝে দুই একটা টাকাও দিতে হয়। স্ত্রীলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দীনভাবে গ্রহণ করে ; ভাল করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারে না, ভাঙা গদগদ স্বরে বলে, 'বাবা, ভগবান আপনাকে রাজা করুন।'

এক মাস যখন মেয়েটা টিঁকিয়া গেল, তখন আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'বলতে সাহস করি না, বাবা, কিন্তু আর একবার যদি পায়ের ধুলো দেন। আজ মঙ্গলবার, খুঁডব না, কিন্তু আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে। ঋতুরাণী আমার বাঁচবে।'

দেখিয়া আসিয়া আমিও বুঝিলাম, ঋতু বাঁচিবে। একটা মানুষকে

—যতই ঘৃণ্য হউক—যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল।

* * * * *

মাস ছয় সাত পরে কোন এক পর্ব্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছি, ঘাটের উপর একটি মেয়ে হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী, গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখখানিও মন্দ নয়—সদ্য স্নান করিয়া ভিজা চুলে আমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিনিতে পারিলাম না। সে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লজ্জিত চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি ঋতু।'

নিজের কৃতিত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ চোখের উপর দেখিয়া প্রচুর আনন্দ হইবার কথা, কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার গৃহস্থকন্যার মত সলজ্জ কোমল মূর্ত্তিটি চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, তাহাকে না বাঁচাইলে বোধ হয় ভাল হইত।

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত; কিন্তু আর একটু আছে। সেটুকু বলিতেই হইবে, সঙ্কোচ করিলে চলিবে না।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ঋতুর মা অনেক দিন পরে আমার কাছে আসিল। মনটা খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর সে যে প্রস্তাব করিল তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহাদেরও নাকি নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান আছে, ঘটা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। ঋতুর শুভ বলিদান কার্য্যটা আমার মত সৎ পাত্রের দ্বারাই ঋতুর মাতা সম্পন্ন করাইতে চায়।

অজস্র গালাগালি দিয়া অকৃতজ্ঞ পতিতা স্ত্রীলোকটাকে তাড়াইয়া

দিলাম। সে ভীত নির্ব্বোধের মত মুখ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, আমার অসংযত উষ্মার কারণটাই যেন বুঝিতে পারিল না।

তারপর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; আমার বয়স এখন চল্লিশ। সেদিনের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, ঋতুর মাতা 'মন্দ লোক' ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় অকৃতজ্ঞ ছিল না। আদর্শের মাপকাঠি সকলের সমান নয়; বৈষ্ণবের কাছে যাহা মহাপাপ, শাক্তের কাছে তাহা পুণ্য। মানুষের অন্তর-গহনে যাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার তিনি হয়ত বুঝিয়াছিলেন, ঋতুর মাতা আমাকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিতে আসে নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিল—তাহার দীন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিণীর মত আমার পদপ্রান্তে রাখিয়াছিল।

প্রতিধ্বনি

মানুষের চরিত্র যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে সে সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই। বরং একটানা সংগতি দেখিলেই কেমন একটা বিস্ময় জাগে, সন্দেহ হয় কোথাও বুঝি কিছু গলদ আছে।

কিন্তু যে লোকটার জীবনধারা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, সে যদি কেবল একটা বাড়ি কিনিবার ফলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবদের মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। সোমনাথ সম্বন্ধে আমরাও একটু বিশেষ রকম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম।

সোমনাথ বরদার আষাঢ়ে গল্পের আসরে বড় একটা যোগ দিত না

বটে, তবু সে আমাদের সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। একেবারে প্রাণ-খোলা লোক—অত্যন্ত মিশুক ও আমুদে—হাসিয়া-খেলিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছিল। বাপ মৃত্যুকালে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্নচিন্তা ছিল না। বিবাহের তিন-চার বছরের মধ্যে স্ত্রীও মারা গিয়াছিল, কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হইয়াও সে আর বিবাহ করে নাই। প্রাণখোলা লোক হইলেও তাহার সুবুদ্ধির দ্বারে যে অর্গল ছিল, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মারাত্মক রকম বদ্‌খেয়ালীও তাহার কিছু ছিল না। বিহার-প্রান্তের বৈচিত্র্যহীন শহরে জীবনটা নেহাৎ একঘেয়ে হইয়া পড়িলে কলিকাতায় গিয়া কিছু দিন নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া আসিত। তার পর আবার হৃষ্ট মনে বিলিয়ার্ড খেলায় মনোনিবেশ করিত। তাহার জীবনে একটি মাত্র নেশা ছিল—ঐ বিলিয়ার্ড খেলা। সিগারেট পর্য্যন্ত তাহাকে কোনও দিন খাইতে দেখি নাই; কিন্তু শহরে থাকিয়াও সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড খেলিবার জন্য ক্লাবে আসে নাই, এমন একটা দিনও মনে করিতে পারি না।

বাড়িকেনার ব্যাপারটাও যে বিলিয়ার্ড খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পৈতৃক বাড়ি ছিল—মন্দ বাড়ি নয়—একটু সেকেলে-গোছের হইলেও ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। তবু সে সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া আর একখানা বাড়ি কিনিয়া বসিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এক বিলিয়ার্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের মিউনিসিপ্যাল সীমানার এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটি পুরাতন বাড়ি ছিল এবং বাড়িতে একটি অতি পুরাতন মেম বাস করিত। বস্তুত বাড়ি অথবা বুড়ী কোন্‌টি বেশী পুরাতন এ লইয়া আমাদের মধ্যে

অনেক দিন তর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষে আমাদের মধ্যে কেহ একজন গেজেটিয়ার খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, বাড়িটাই অগ্রজ। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে এক নীলকর সাহেব এই কুঠী তৈয়ার করাইয়াছিল, ক্রমে নীলের ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় উহা পারিবারিক বাসভবনে পরিণত হইয়াছিল। তার পর তিন পুরুষ ধরিয়া নীলকর সাহেবের বংশধরেরা এইখানেই বাস করিতেছে। বুড়ী শেষ উত্তরাধিকারিণী।

আমাদের তর্কের নিষ্পত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল—বাড়ি অথবা বুড়ী শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি টিকিয়া থাকিবে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বুড়ী হারিয়া গেল। একদিন শুনিলাম তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে।

বুড়ী চিরকুমারী, তাই সাক্ষাৎ ওয়ারিস কেহ ছিল না। অল্প দিন পরে শোনা গেল বাড়ি বিক্রয় হইবে। নেহাৎ খেয়ালের বশেই একদিন বৈকালে আমরা কয়েক জন দেখিতে গেলাম। সোমনাথের মোটর আছে, তাহার মোটরে চড়িয়াই অভিযান হইল।

ফাঁকা মাঠের মত বিস্তৃত গঙ্গার তীরে অনুচ্চ পাঁচিলে ঘেরা 'ভিলা'-জাতীয় বাড়ি। চতুষ্কোণ বাড়ি, চারি দিকে নীচু বারান্দা—মধ্যস্থলটা প্রায় দ্বিতলের মত উঁচু হইয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ নিতান্ত সঙ্গীহীন ভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ির পিছন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত; সম্মুখে ফটকের স্তম্ভে শ্বেত পাথরের ফলকের উপর নাম লেখা আছে—"Echoes"—প্রতিধ্বনি।

বাড়ির একজন মুসলমান চৌকিদার ছিল, সেও বোধ করি বুড়ীর সমসাময়িক। চাবি খুলিয়া বাড়ির ভিতরটা আমাদের দেখাইল। সুসজ্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, চেয়ার সোফা পালঙ্ক ঘরে ঘরে যেমন ছিল তেমনি সাজানো আছে। বাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড

হল-ঘর। ছাদ খুব উচ্চ—বহু ঊর্ধ্বে কাচে ঢাকা স্কাই-লাইট দিয়া আলো আসার ব্যবস্থা। তবু ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন।

চৌকিদার সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, কয়েকটা বাল্ব একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর সবুজ আবরণে ঢাকা তিনটি বাল্ব, কেবলমাত্র টেবিলের সমতল পৃষ্ঠের উপর আলো ফেলিয়াছে। ঘরে অন্য আভরণ বিশেষ কিছু নাই। দেয়ালের ধারে দুইটি সেটি, একধারে বিলিয়ার্ড-যষ্টি রাখিবার র‍্যাক্—তাহাতে সারি সারি কয়েকটি 'ক্যু' রাখা আছে। দেয়ালের গায়ে একটি কালো রঙের মার্কিং বোর্ড, কত দিনের পুরানো বলা যায় না, তাহাতে অঙ্কের চিহ্নগুলি একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে তাকাইয়া সোমনাথ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ!'

সত্যই ঘরের আধা অন্ধকার মোলায়েম আবহাওয়া মনের উপর একটা অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে, ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাই সোমনাথকে সমর্থন করিয়া আমিও ঐ জাতীয় একটা কিছু বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলিল, 'আ—ঃ!'

চমকিয়া পিছনে তাকাইলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও পিছনে তাকাইয়াছিল—কিন্তু পিছনে কেহই নাই। আমরা উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধ চৌকিদার ভাঙা গলায় বুঝাইয়া দিল যে উহা প্রতিধ্বনি। এ ঘরে প্রতিধ্বনি আছে, কথা কহিলে অনেক সময় কথার ভগ্নাংশ ফিরিয়া আসে।

আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু মনে একটু ধোঁকা লাগিয়া রহিল।

চৌকিদার অতগুলো কথা কহিল, কই তাহার একটা কথাও তো ফিরিয়া আসিল না।

যা হোক, পরিদর্শন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে সোমনাথ একবার বলিল, 'খাসা বাড়িখানি। আর ঐ বিলিয়ার্ড রুমটা—চমৎকার।'

বিলিয়ার্ড-রুমের চমৎকারিত্ব তাহাকে কত দূর মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম দিন-দশেক পরে, যখন শুনিলাম সে বাড়িখানি খরিদ করিয়াছে। তার পর আরও বিস্ময়কর সংবাদ, সে পৈতৃক বাড়ির বাস তুলিয়া দিয়া নবক্রীত বাড়িতে উঠিয়া গেল। গৃহপ্রবেশের দিন আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল বটে, কিন্তু কেন জানি না সমস্ত ব্যাপারটাতে আনন্দ-উৎসবের স্পর্শ লাগিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল এটা সোমনাথের চিরবিদায় ভোজ।

দাঁড়াইলও তাই। দুই মাইল দূরে উঠিয়া গেলে পুরাতন বন্ধু কিছু পর হইয়া যায় না, কিন্তু সোমনাথ যেন মনের দিক্ দিয়াও আমাদের অনেক দূরে সরিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে ক্লাবে আসিত এবং আগের মত হাসিগল্প করিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু দেখিলাম তাহার মনটা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন সমস্ত গল্প কৌতুক ও খেলায় মনপ্রাণ ঢালিয়া যোগ দিতে পারিত, এখন আর তেমন পারে না। তাহার প্রাণখোলা হাসিটাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, যে এত দিন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল সে যেন অকস্মাৎ অবাস্তব ছায়ায় পরিণত হইয়াছে।

ক্লাবে বসিয়া সোমনাথ সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল।

পৃথ্বি বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ। বাড়িটা সোমনাথকে গিলে খেয়েছে। —কদ্দিন এদিকে আসে নি?'

আমার হিসাব ছিল, বলিলাম, 'আমাদের 'জনা' অভিনয়ের রাত্রে তাকে শেষ দেখেছি। মাসখানেক হ'ল।'

অমূল্য বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ-টাষাণ নয়। আসলে নিজের বিলিয়ার্ড টেবিল পেয়েছে, রাতদিন তাই খেলছে।'

বরদা এক পাশে বসিয়া ছিল, কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

অমূল্য ভ্রূ তুলিয়া তাহার দিকে ফিরিল, 'হুঁ মানে? বলতে চাও কি? তাকে ভূতে পেয়েছে?'

বরদা উত্তর দিল না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর চক্ষু নামাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যে-রাত্রে সোমনাথ আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়েছিল, সে রাত্রির কথা মনে আছে?'

'কোন্ কথা?'

'খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি আর সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলেছিলে—বোধ হয় ভোল নি। আমি ব'সে তোমাদের খেলা দেখছিলুম। সে সময় তোমার নিজের খেলার কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য কর নি?'

লক্ষ্য যে করিয়াছিলাম তাহা নিজের কাছেও এত দিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করি নাই, অথচ বরদা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। ভাল খেলোয়াড় বলিয়া আমার অহংকার নাই, কিন্তু সেদিন আমার খেলা আশ্চর্য রকম খুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক বার বল মারার সময় মনে হইয়াছিল আমি খেলিতেছি না, আর কেহ আমার হাত ধরিয়া খেলিয়া দিতেছে। আমি হয়ত 'পট রেড' মারিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলের সহিত 'ক্যু'য়ের সংস্পর্শ ঘটিবার পূর্ব মুহূর্তে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার হাতে ঈষৎ নাড়া দিয়া আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে।

ফলে আমার বল 'রেড্'কে স্পর্শ করিয়া সমস্ত টেবিল ঘুরিয়া একটা অসম্ভব পকেটে প্রবেশ করিয়াছে। এমনি অনেক বার ঘটিয়াছিল। ক্রমে আমার মনে এমন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যন্ত্রচালিতের মত খেলিয়া গিয়াছিলাম। সোমনাথ সেদিন আমাকে হারাইতে পারে নাই।

খেলার শেষে মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে এই বলিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, খেলার ক্ষেত্রে দৈবাৎ এ-রকম অঘটন ঘটিয়া যায়, নিকৃষ্ট খেলোয়াড়ও হঠাৎ ভাল খেলিয়া ফেলে। কিন্তু ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে, তাহা তখন ভাবি নাই। আজ বরদা স্মরণ করাইয়া দিতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলাম।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছি দেখিয়া বরদা বলিল, 'তাহ'লে লক্ষ্য করেছিলে। আমি আর একটা জিনিষ শুনেছিলুম যা তোমরা কেউ শোন নি। খেলায় তন্ময় ছিলে ব'লেই বোধ হয় শুনতে পাও নি।'

'কি ?'

'হাততালির শব্দ। সোমনাথ একটা খুব সুন্দর মার মেরেছিল; তিনটে বলে ঠোকাঠুকি হয়ে তিনটেই একই পকেটে গেল। ঠিক তার পরে কে যেন খুব মোলায়েম হাতে হাততালি দিয়ে উঠল।'

অমূল্য বলিল, 'ওটা প্রতিধ্বনি। যেখানে সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ভূত-প্রেত টেনে আনার মানে বুঝি না।—বলে বলে ঠোকাঠুকি হওয়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হ'লে সেটা হাততালির মতই মনে হয়।'

বরদা বলিল, 'আশ্চর্য্য বলতে হবে। বল ঠোকাঠুকি ত বরাবরই হচ্ছিল, তবে প্রতিধ্বনিটা ঠিক সেই সময়েই হ'ল কেন ?'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। 'বহুরূপী' নাম দিয়া যে ব্যাপারটা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ঘটিবার পর হইতে বরদার গল্প সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব বেশ একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকলেরই নাস্তিকতার গোড়া একটু আল্গা হইয়া গিয়াছিল। চূণী তো বিস্তর বই কিনিয়া মহা উৎসাহে প্রেততত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অমূল্য যদিও এখনও তর্ক করিতে ছাড়ে নাই, তবু তাহার ঝাঁঝ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

হৃষী আমাদের আলোচনাকে সিধা পথে ফিরাইয়া আনিল, বলিল, 'সে যা হোক, কথাটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কি ?—সোমনাথ যে বাড়ি কিনে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল, আমাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে, এর কারণটা তো কেউ দেখাতে পারল না। তাকে ভূতে পেয়েছে এ-কথায় শ্রদ্ধা করা যায় না। তবে হয়েছে কি তার ?'

বরদা আস্তে আস্তে বলিল, 'আমার কি মনে হয় জান ? সোমনাথ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী মনের মতন সংগী পেয়েছে। পুরনো বাঁধনের পাশে খুব শক্ত নূতন বাঁধন পড়েছে, তাই পুরনো বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে।'

বরদার কথার ইংগিতটা ভুল করিবার মত নয়, কিন্তু এতই উহা আজগুবি যে নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়াও যায় না। অমূল্য আমাদের সকলের মনের ভাব যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, এক দংগল ভূতের সংগে সোমনাথের এতই দহরম-মহরম হয়ে গেছে যে মানুষের সংগ আর তার ভাল লাগছে না ?'

এবারও বরদা সোজাসুজি উত্তর দিল না, বরঞ্চ যেন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন

পরে কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল, 'Echoes—প্রতিধ্বনি! অদ্ভুত নাম বাড়িটার। যে-লোক বাড়ি তৈরি করিয়েছিল সেই হয়ত নামকরণ করেছিল। কিংবা তার পরবর্ত্তীরা বাড়ির আবহাওয়া দেখে নাম রেখেছিল—'প্রতিধ্বনি'!'

চূণী এতক্ষণ বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, কথা বলে নাই। এখন একবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'কিছু দিন থেকে একটা থিওরি আমার মাথায় ঘুরছে—'

'কিসের থিওরি?'

'এই সব হানা-বাড়ি সম্বন্ধে। এখনও থিওরিটা খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি, তবু—'

'কি থিওরি তোমার শুনি।'

চূণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'ঐ প্রতিধ্বনি শব্দটার মধ্যেই আমার থিওরির বীজ নিহিত রয়েছে। দেখ, শব্দের যেমন প্রতিধ্বনি আছে, তেমনি বাস্তব ঘটনারও প্রতিধ্বনি থাকতে পারে না কি? প্রতিধ্বনি না ব'লে তাকে প্রতিবিম্বও বলতে পার—ব্যাপারটা মূলে একই। ধ্বনির প্রতিধ্বনি সব সময় থাকে না, এই ঘরের মধ্যে তোমরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও এতটুকু প্রতিধ্বনি পাবে না। আবার এমন এক-একটা স্থান আছে যেখানে চুপি চুপি একটা কথা উচ্চারণ করলেও কোন্ অদৃশ্য প্রতিবন্ধকে ধাক্কা খেয়ে সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। আমার মনে হয় হানা-বাড়িগুলোও এই জাতীয় স্থান। গ্রামোফোন রেকর্ডের মত তারা অতীতের কতকগুলো বাস্তব ঘটনা সঞ্চয় ক'রে রাখে, তার পর সুবিধে পেলেই তার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। বরদা, তোমার কি মনে হয়?'

থিওরিটা অভিনব বটে, কিন্তু বরদার মুখ হইতে ইহার অনুমোদন

আশা করা যায় না। সে গোঁড়া ভূত-বিশ্বাসী, অথচ থিওরি সত্য হইলে ভৌতিক কাণ্ড মাত্রেই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—প্রেতযোনির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু থাকে না।

বরদা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহ'লে তোমার মতে প্রেতযোনি নেই! যেগুলোকে ভৌতিক phenomenon ব'লে মনে হয় সেগুলো অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র?'

চুণী বলিল, 'না, তা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই, প্রেতযোনি থাকে থাক্, কিন্তু হানা-বাড়িতে সাধারণতঃ যে-সব ব্যাপার ঘটে থাকে, সেগুলো হয়ত অধিকাংশই এই প্রতিধ্বনি-জাতীয়।'

আমি বলিলাম, 'সোমনাথের বাড়িতে প্রতিধ্বনি আছে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেটা কোন্ জাতীয়?'

চুণী বলিল, 'সেইটেই আমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই।—তোমরা কেউ রাজি আছ?'

'কি করতে হবে?'

'আমি স্থির করেছি এক দিন সোমনাথের বাড়িতে গিয়ে রাত্রি যাপন করব। সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আবশ্যক, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়েও পরীক্ষাটা তুচ্ছ হবে না; আর যদি সে এমন কিছু পেয়ে থাকে যার তুলনায় তার আজন্মের সমস্ত বন্ধন ঢিলে হয়ে গেছে, তাহ'লে সেই অপূর্ব্ব বস্তুটি কি তাও আমাদের জানা দরকার।'

অমূল্য একটু মুখ বাঁকাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিল—

'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে—'

যদি সুবিধে হয় গোটাকয়েক প্রেতাত্মা বরদার জন্য চেয়ে নিয়ে এস, আমাদের এই ক্লাব-ঘরে পুষে রাখা যাবে।'

আমি চুণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি। কালই চল তাহ'লে, শনিবার আছে।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সোমনাথের বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম, তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রকাণ্ড হাতার মাঝখানে বাড়িখানা যেন একেবারে জনশূন্য মনে হইল।

বাড়ির বারান্দায় উঠিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি ও চুণী পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। চাকর-বাকর কেহই কি নাই? সব গেল কোথায়?

হাঁক দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ভিতর হইতে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ভুল হইবার নয়. বিলিয়ার্ড বলের ঠোকাঠুকি লাগার শব্দ। আশ্চর্য বোধ হইল। এই ভর-সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলিতেছে! কাহার সহিত খেলিতেছে?

দু-জনে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কোনও ঘরে এখনও বাতি জ্বলে নাই, কেবল বিলিয়ার্ড-রুম হইতে আলো আসিতেছে। আমরা নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

টেবিলের উপরকার সবুজ শেড-ঢাকা বাতি তিনটি শুধু জ্বলিতেছে—তাহাদের আলোক-চক্রের বাহিরে ঘর অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকারের সীমানায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া সোমনাথ আত্মনিমগ্ন ভাবে 'ক্যু'এর মুখাগ্রে খড়ি লাগাইতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

চুণী বলিয়া উঠিল, 'কি হে, একলাই খেলছ?'

'কে?' সোমনাথ চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তার পর দ্রুত দ্বারের

কাছে আসিয়া সুইচ্ টিপিল ; ঘরের অন্য আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের দেখিয়া সে প্রথম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল, যেন ভাল করিয়া চিনিতেই পারিল না। আমরাও অপ্রতিভভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, আমাদের সহিত তাহার মনের সংযোগ এমন পরিপূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে সহসা জোড়া লাগাইতে পারিতেছে না।

যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত হাসির একটি চেষ্টা করিয়া সে বলিল, 'আরে—তোমরা! তার পর—হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

সোমনাথের কণ্ঠে যে সহজ অকৃত্রিম সমাদরের সুর শুনিতে আমরা অভ্যস্ত তাহা যেন ফুটিল না। আমি সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'ব্যাপার কিছু নয়, তোমার ঘরকন্না দেখতে এলুম।—একলা বিলিয়ার্ড খেলছিলে নাকি?'

'একলা!' কথাটা বলিয়াই সে সামলাইয়া লইল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, একলাই খেলছিলুম।—এস, বাইরে বসা যাক্।'

ঘরের আলো নিবাইয়া সোমনাথ আমাদের বারান্দায় লইয়া গিয়া বসাইল। এতক্ষণে বাহিরেও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ঝাউ গাছটাতে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছিল। সে বলিল, 'আলো জেলে দেব, না, অন্ধকারেই বসবে?''

চূণী বলিল, 'ক্ষতি কি, অন্ধকারেই বসা যাক।'

বেতের মোড়ায় তিন জনে চুপচাপ বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ সোমনাথ বলিল, 'চা খাবে?'

চূণী উত্তর দিল, 'না, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি।'—তার পর একবার গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, 'তুমি দিন-দিন যে-রকম ডুমুর-ফুল হয়ে উঠছ, ভয় হ'ল দু-দিন বাদে হয়তো চিনতেই পারবে না। তাই আজ

তোমার বাড়িতে রাত কাটাব ব'লে এসেছি। পুরনো বন্ধুত্ব মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হবে তো?'

এক মুহূর্ত সোমনাথ জবাব দিল না, তার পর যেন একটু বেশী মাত্রায় ঝোঁক দিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেশ তো বেশ তো। তা, দাঁড়াও— আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাবুর্চ্চিটাকে খবর দিই, তোমাদের খানার ব্যবস্থা করুক।' সোমনাথ উঠিয়া গেল।

মনে মনে ভারি কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। বন্ধুত্বের দাবীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অপর পক্ষের মনে অনাগ্রহের আভাস পাইলে গ্লানির আর অন্ত থাকে না। সোমনাথ বাহিরে হৃদ্যতার ভান করিতেছে বটে. কিন্তু অন্তরের সহিত আমাদের সাহচর্য্য চায় না—তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। আগেকার অবাধ স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা আর নাই। শুধু তাই নয়, আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহার সুনিয়ন্ত্রিত কার্যধারায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইয়াছি। চূণী খাটো গলায় বলিল, 'কি হে, কি রকম মনে হচ্ছে?'

'সুবিধের নয়। ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'উঁহু—থাকতে হবে।'

চুণী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু থামিয়া গেল। পরিপূর্ণ অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, অস্পষ্ট শব্দে বুঝিলাম সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া মোড়ায় বসিল। মোড়ার মচ্ মচ্ শব্দ যে শুনিয়াছিলাম তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চুণী সহজ আলাপের সুরে সোমনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'তার পর, একলা থাকতে তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না?'

সোমনাথ উত্তর দিল না।

এই সময়, কেন জানি না, আমার ঘাড়ের রোঁয়া হঠাৎ শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। চুণীও হয়তো কিছু অনুভব করিয়া থাকিবে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে হঠাৎ দেশলাই জ্বালিল। দেখিলাম সোমনাথের মোড়ায় কেহ বসিয়া নাই।

দেশলাইয়ের কাঠি শেষ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল। অবরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া চুণী মৃদুস্বরে বলিল, 'প্রতিধ্বনি।'

এইবার সোমনাথের স্পষ্ট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, শব্দটা কাছে আসিলে চুণী বলিয়া উঠিল, 'সোমনাথ?'

'হাঁ।'

'আলোটা জেলে নাও ভাই, অন্ধকার আর ভাল লাগছে না।' কথার শেষে হাসিতে গিয়া তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিয়া সোমনাথ আসিয়া বসিল। সাদা ঢাকনির মধ্যে মৃদুশক্তি বাল্‌বে স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্ধকারের চেয়ে এ ভাল, তবু পরস্পর মুখ দেখা যায়।

সোমনাথ বলিল, 'বাবুর্চ্চিকে বলে এলুম। শুধু মুর্গির কারি আর পরটা। তার বেশী কিছু যোগাড় হয়ে উঠল না।'

ইতিমধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া চুণী বলিল, 'যথেষ্ট যথেষ্ট। অমৃতের ব্যবস্থা থাকলে পাঁচ রকম ব্যঞ্জনের দরকার হয় না।--কিন্তু তুমি বাবুর্চ্চি রেখেছ যে!'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রাখি নি ঠিক। বাড়ির যে বুড়ো চৌকিদারটা ছিল সে-ই রেঁধে দেয়—'

'রাঁধুনী বামুন পেলে না?'

'দরকার বোধ করি না। আমি একলা মানুষ—'

'চাকরও তো দেখছি না। চাকর রাখ নি কেন?'

'রেখেছিলাম এক জন, কিন্তু—'

'রইল না?' চুণী মোড়া টানিয়া লইয়া সোমনাথের নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'আসল কথাটা কি বল তো সোমনাথ। বাড়িতে কিছু আছে—না?'

মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া সোমনাথ বলিল, 'কি থাকবে?'

'সেই কথাই তো জানতে চাইছি। শহরের এক টেরে এই পুরনো বাড়ি, চাকর-বামুন থাকতে চায় না—কিছু থাকা বিচিত্র নয়।'

সোমনাথের চোখের উপর অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিল। সে হাসিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, পাগল না ক্ষ্যাপা। ওসব কিছু নয়। শহর থেকে দূর পড়ে তাই চাকরবাকর থাকতে চায় না।'

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। ইচ্ছা করিলে যে অনেক কিছু বলিতে পারে তাহাও বুঝা গেল; কারণ সোমনাথ মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, মুখে চোখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু লুকাইতে চায় কেন? যাহা সে জানিয়াছে তাহার অংশীদার রাখিতে চায় না—কৃপণের মত একা ভোগ করিতে চায়? কিংবা অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে বলিতে চায় না?

চুণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সোজাসুজি জেরায় ফল হইল না দেখিয়া সে অন্য পথ ধরিল। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর হানা-বাড়ি সম্বন্ধে নিজের থিওরির কথা পাড়িল। বেশ ফলাও করিয়া লেকচারের ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া নিজের থিওরির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে লাগিল। সোমনাথও দেখিলাম একমনে গালে হাত দিয়া শুনিতেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চারি পাশে যে একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটিতে

আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বোধ করি ইহারা দু'জনে জানিতে পারে নাই। প্রথমটা আমিও লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু হঠাৎ এক সময় মনে হইল কাহারা নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র মনে চুণীর কথা শুনিতেছে। চোখে কিছুই দেখিলাম না, এমন কি কানে কিছু শুনিয়াছিলাম এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবু কেমন করিয়া এই অদৃশ্য আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিলাম তাহা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। কিন্তু জানিতে যে পারিয়াছিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইহা অনুমান বা উত্তেজনা জনিত কল্পনার রূপায়ন নয়—স্পর্শ করবার মত অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতি। অপরিস্ফুট আলোকে তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু তাহারা যে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ ভাবে চুণীর কথা শুনিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতই সত্য।

ক্রমে একটি অতিমৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাজা ফুলের বা আতর এসেন্সের গন্ধ নয়—পপৌরির মত একটু বাসি অথচ সুমিষ্ট সৌরভ। ধীরে ধীরে গন্ধ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, জিয়ানো ল্যাভেণ্ডার ফুলের গন্ধ।

চুণী তখনও থিওরি ব্যাখ্যা করিতেছিল, তাই গন্ধ নাকে গেলেও সে বোধ হয় উহা লক্ষ্য করে নাই। আলোচনা শেষ করিয়া সে বলিল, 'অবশ্য এটা আমার মনগড়া কাল্পনিক থিওরি। তবু কিছু ভিত্তি কি এর নেই? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?'

সোমনাথ মুখ তুলিয়া বোধ করি একটা কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল, চুণী সচকিত ভাবে চারি দিকে চাহিয়া বলিল, 'গন্ধ! কিসের গন্ধ!'

আমি বলিলাম, 'পেয়েছ তাহ'লে। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।'

সোমনাথের চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ! না না, ও তোমাদের ভুল। গন্ধ কই? আমি তো কিছু পাচ্ছি না।'

চুণী বলিল, 'সত্যি পাচ্ছ না?'

'না—কিচ্ছু না—' বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িল। সে যেন জোর করিয়াই গন্ধটা উড়াইয়া দিতে চায়।

কিন্তু গন্ধকে উড়াইয়া লইয়া গেল অন্য জিনিষ। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বাড়ির ভিতর দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গন্ধটুকু এক নিমেষে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিস্মিতভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম: ঝাউগাছের জোনাকি মণ্ডিত বিরাট্ দেহ অন্ধকারে চোখে পড়িল। ঝাউগাছ একেবারে নিস্তব্ধ; অল্পমাত্র বাতাস বহিলে যে-গাছ মর্ম্মরধ্বনি করিয়া উঠে, তাহাতে শব্দমাত্র নাই।

সোমনাথ আবার মোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; চুণী প্রখর জিজ্ঞাসু নেত্রে চারি দিকে চাহিতেছিল। আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, 'চলে গেছে—যারা এসেছিল তারা আর নেই।—চুণী, গন্ধটাও কি প্রতিধ্বনি?'

তার পর, গরুর গাড়ী যেমন ভাঙা অসমতল পথ দিয়া চলে, তেমনি অসংলগ্ন বাধাবহুল আলোচনার ভিতর দিয়া আহারের পূর্ব্বের ঘণ্টা-দুই সময় কাটিয়া গেল। সোমনাথ মুহ্যমান হইয়া রহিল, আমরাও মনের মধ্যে একটা নামহীন অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধারণ আর কিছু অনুভব করিলাম না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যেন আমাদের অধিকার-বহির্ভূত কৌতূহল দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে চলিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দে আহার শেষ হইল; বুড়া চৌকিদার পরিবেশন করিল।

অনুভবে বুঝিলাম সেও আমাদের উপর খুশী নয়। তাহার সাদা ভ্রূযুগল নীরবে আমাদের ধিক্কার দিতে লাগিল। অবরোধের পর্দ্দার ভিতর উঁকি মারিবার চেষ্টা করিয়া আমরা যেন বর্ব্বরোচিত অশিষ্টতা করিয়াছি।

বারান্দার এক প্রান্তে তিনটি ক্যাম্প-খাট পাড়িয়া শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। কোনও মতে. রাত্রিটা কাটিলে যেন বাঁচা যায়।

তিন জনে পাশাপাশি শুইয়া আছি; কথাবার্ত্তা নাই। চুণী শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছে, অন্ধকারে তাহার সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সোমনাথ একেবারে নিশ্চল হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা জোনাকি আমাদের বিছানার চারিপাশে উড়িয়া উড়িয়া যেন পাহারা দিতেছে।

নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, চুণীর থিওরির সহিত তাহা একেবারে বে-খাপ নয়। তবু যাহারা চুণীর কথা শুনিতেছিল তাহারা কি শুধুই অতীতের প্রতিবিম্ব? সোমনাথ এ-বিষয়ে এমন একগুঁয়ে ভাবে নীরব কেন? অতীতের ছায়ার সহিত বর্ত্তমানের মানুষের এমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটে কি করিয়া? আর, যদি সজীব স্বতন্ত্র আত্মা হয়, তবে উহারা কাহারা? ল্যাভেণ্ডারের ফুলের গন্ধ কেন আসিল? সেকালে ইংরেজ মেয়েদের ল্যাভেণ্ডার ফুল একটা সৌখীনতা ছিল শুনিয়াছি। সেই গন্ধ অতীতের কোন্ দেহ-সৌরভের সহিত মিশিয়া ভাসিয়া আসিল।...

বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত চেতনা সতর্ক হইয়া জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া রহিলাম, তার পর বাড়ির ভিতর হইতে পরিচিত খট্‌খট্‌ শব্দ কানে আসিল।

ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম চূর্ণী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। সে নিঃশব্দপদে উঠিয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, 'শুনতে পাচ্ছ? —সোমনাথ বিছানায় নেই, কখন উঠে গেছে। এস—দেখা যাক। শব্দ ক'রো না।'

তন্দ্রার মধ্যে এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রেডিয়াম-যুক্ত হাতঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি সাড়ে এগারটা। অন্ধকারে পা টিপিয়া দু-জনে বিলিয়ার্ড-ঘরের দিকে চলিলাম।

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইলাম না। টেবিলের উপর তেমনি তিনটি আলো জ্বলিতেছে—বাকি ঘর অন্ধকার। সোমনাথ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বল মারিতেছিল, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাবেলার সেই অবসাদগ্রস্ত মুহ্যমান ভাব আর নাই। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, খেলার আনন্দ প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, কয়েক মাস আগে সোমনাথ এমনিই ছিল, বাড়ি কিনিবার পর হইতে তাহার এই প্রাণখোলা আমোদে-মাতিয়া-ওঠা মূর্ত্তি আর দেখি নাই।

বল মারিয়া সোমনাথ লঘু কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তার পর নিজেই সচকিতে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া মৃদু স্বরে কি একটা বলিল। পরক্ষণে আর একটি সুমিষ্ট হাসির শব্দ কানে আসিল। হয়তো ইহা সোমনাথের হাসির প্রতিধ্বনি, কিন্তু পর্দ্দায় ও মিষ্টতায় এত প্রভেদ যে রমণীকণ্ঠের হাসি বলিয়া ভ্রম হয়।

খেলা চলিতে লাগিল। সোমনাথ একা খেলিতেছে, তবু যেন একা খেলিতেছে না; কাহারও সহিত কৌতুকপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সম্মোহিতের মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সোমনাথ খেলিতেছে, মৃদুস্বরে কাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, সন্তর্পণে গলা

নামাইয়া হাসিতেছে। প্রতিধ্বনিও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে, কখনও ভারী গলায় গম্ভীর আওয়াজ হইতেছে, আবার কখনও কোমল কণ্ঠের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু-ভাষণ কানে কানে অর্থহীন কথা বলিয়া যাইতেছে।

সমস্তই যেন চুপি চুপি। লুকাইয়া লুকাইয়া আমোদ-কৌতুক চলিতেছে, তাই রঙ্গ-রস আরও গাঢ় হইয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমরাই এই লুকোচুরির লক্ষ্যবস্তু আমাদের জন্যই ইহারা প্রকাশ্য মজলিশ জমাইতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া রস-ভঙ্গ করিয়াছিলাম, পাছে জাগিয়া উঠিয়া আবার বিঘ্ন করি তাই গভীর রাত্রে এই ত্রস্ত সতর্কতা।

আমাদের পাশ দিয়া কে একজন চলিয়া গেল। চুণী নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। চুণী জিজ্ঞাসা করিল, 'সোমনাথ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলে?'

'না। চোখে দেখি নি—কিন্তু—'

'জানি। কিন্তু সেগুলো যে আমাদের মনের কল্পনা নয় তার প্রমাণ কি? সোমনাথ হয়তো পাগল হয়ে গেছে। তাই নিজের মনে হাসছে কথা কইছে।'

'কিন্তু গন্ধ? আওয়াজ? এগুলো কি?'

'এগুলো প্রতিধ্বনি হ'তে পারে। হয়তো এই প্রতিধ্বনিই সোমনাথকে পাগল ক'রে দিয়েছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা চোখে কিছু দেখি নি; শুধু শব্দ আর গন্ধ। অতীতের কতকগুলো শব্দ-গন্ধ এই বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তাতে দেহ-বিমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।'

প্রমাণ যে হয় তাহার পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম। জোনাকির উল্লেখ

আগে কয়েকবার করিয়াছি; এখন দেখিলাম—কয়েকটা জোনাকি আমাদের মুখের সামনে আসিয়া শূন্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তাহাদের সঞ্চরমান নীল আলো ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া জমাট আকার ধারণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি মুখ ঐ জোনাকির আলোয় শূন্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল জানি না, কিন্তু একটি পাংশু নীলাভ নারী মুখ স্পষ্ট আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—যেন অন্ধকারের পটে জোনাকির আলো দিয়া একটি ছবি আঁকা হইতেছে! মোমে গড়া মুখোষের মত নিশ্চল মুখ কিন্তু চোখে কটাক্ষ রহিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য একটি জীবন্ত মানুষী অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করিলাম।

তারপর জোনাকিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। দেহের সমস্ত পেশী শক্ত করিয়া রহিলাম, বুকের স্পন্দন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া কণ্ঠের কাছে ধাক্কা খাইতে লাগিল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল জানি না।

আমি প্রথম কথা কহিলাম, 'চূণী, এবার চোখে দেখা হয়েছে? এও কি প্রতিধ্বনি?'

চূণী উত্তর দিল না; আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

* * * *

পরদিন সকালে বিলিয়ার্ড-রুমে দাঁড়াইয়া সোমনাথের নিকট বিদায় লইলাম। চূণীর চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল; সম্ভবতঃ আমার মুখখানাও নিশ্চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আয়নার অভাবে নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

চূণী বলিল, 'একটা রাত্রি তোমাকে খুবই জ্বালাতন করলুম। কিছু মনে ক'রো না সোমনাথ।'

সোমনাথ বলিল, 'না না—সে কি কথা—'

চুণী বলিল, 'যা হোক, আমাদের দিক্ থেকে অভিযান একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কতকগুলো নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আমাদের দুঃখ শুধু এই যে, তোমার অভিজ্ঞতা তুমি আমাদের কাছে লুকিয়েই রাখলে, প্রকাশ করলে না।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

'আমার থিওরি কাল তোমায় বলেছি, সেটা সত্যি কিনা ইচ্ছে করলেই তুমি বলতে পারতে।'

'কি—কি বলতে পারতুম?' সোমনাথ ঢোক গিলিল।

'এখনও বলতে পার। কাল রাত্রে আমরা যা যা অনুভব করেছি, সেগুলো কি এই বাড়িতে সঞ্চিত কতকগুলো স্মৃতির ছায়া, না সত্যিকার জীবন্ত কিছু আছে?'

সোমনাথ উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি; কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, 'আছে! আছে! আছে!'

নিশীথে

রায় বাহাদুর দ্বিজনাথ চৌধুরীর কন্যার বিবাহ আগামী কল্য।

দ্বিজনাথ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দস্তুরমত সাহেব, ঘোরতর নীতিপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যপালনে সম্পূর্ণ দয়ামায়াশূন্য। অত্যন্ত রাশভারি লোক; তাঁহার সম্মুখে গুরুতর বিষয় ছাড়া অন্য কথা উত্থাপন করিতে গেলে মনে হয় ধৃষ্টতা করিতেছি। আইন বা নীতি যে-ব্যক্তি একবার রেখামাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, দ্বিজনাথবাবুর গৃহে তাহার প্রবেশ নিষেধ—তা সে যতবড়ই পরমাত্মীয় হোক না কেন।

তাঁহার স্ত্রী, প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মত সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন ; স্বনির্ব্বাচিত পথে চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে অতি গোপনে তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে দেখা যাইত কিন্তু তাহা কেবল অন্তর্য্যামী দেখিতে পাইতেন।

মেয়ের বয়স আঠারো উনিশ। সাহেবিয়ানার দৌলতে সে সমশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সকলের সহিত মিশিতে পাইত ; এমন কি স্বামী নির্ব্বাচন ব্যাপারেও তাহার অভিরুচিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয় নাই। কিন্তু দড়ি লম্বা হইলেও খোঁটা এতই শক্ত ছিল যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াইবার শক্তি তাহার ছিল না।

মেয়ের নাম রূপলেখা। সুন্দর মেয়ে, চোখের দৃষ্টি ভারি নরম, সর্ব্বদাই চোখদুটিতে হাসির টুকরা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। আবার কদাচিৎ বেদনার মেঘে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিতেও পারে। অন্তরের গভীরতা মুখের সহজ স্মিত প্রসন্নতায় সহসা ধরা পড়ে না। রূপলেখাকে তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবী সকলেই লেখা বলিয়া ডাকিত। কেবল দুই জন বলিত—রূপু। একজন তাহার মা ; আর অন্য জন—

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য নয়, দ্বিজনাথবাবু জানিতে পারিলে, অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রূপলেখার বিবাহের আগের সন্ধ্যায় দ্বিজনাথবাবুর ড্রয়িংরুমে একটি মাঝারি গোছের মজলিশ বসিয়াছিল। বাহিরের লোক বড় কেহ ছিল না। দু'চার জন আত্মীয়, রূপলেখার কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী এবং ভাবী বর।

দ্বিজনাথবাবু কোথায় একটা সরেজমিন তজবিজে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই ; বোধ করি কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ বিন্দুটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া

ফিরিবেন না। গৃহিণী ঘরের কোণে একটি বৃহৎ চেয়ারে প্রায় নিমজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিয়া সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত হাসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশেপাশে বৃহদায়তন ঘরের এখানে-ওখানে অতিথিরা বসিয়া মৃদুস্বরে গল্পগুজব করিতেছেন। মাঝে মাঝে তকমাধারী ভৃত্যেরা আসিয়া চা প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া যাইতেছে। ঘরে আলোর বাহুল্য নাই, অথচ অন্ধকারও নয়; বেশ একটি মোলায়েম আবহাওয়া ঘরটিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

ভাবী বরের নাম প্রমথ। সে লাজুক ও ভালমানুষ গোছের যুবক; ওকালতীতে সুবিধা করিতে না পারিয়া সুপারিশের জোরে মুন্সেব পদে উন্নীত হইয়াছে। ওকালতী করিবার জন্য যে সব সদ্‌গুণ আবশ্যক, হাকিমীতে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই সকলেই আশা করিতেছেন—

কিন্তু প্রমথর আদ্যোপান্ত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; সে ভালমানুষ ও সুশ্রী, রূপলেখা তাহাকে পছন্দ করিয়াছে এবং দ্বিজনাথবাবুর আপত্তি হয় নাই—আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ড্রয়িংরুমের যে-দরজাটা একটা বারান্দা পার হইয়া পাশের বাগানে গিয়া পড়িয়াছে তাহারই এক পাশে একটা কৌচে বসিয়া প্রমথ একাকী চা পান করিতেছিল ও চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। এই চকিত চাহনির কারণ, রূপলেখা এতক্ষণ এই ঘরেই ছিল কিন্তু সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্বিজনাথবাবুর একটি বর্ষীয়সী আত্মীয়া হঠাৎ আসিয়া প্রমথর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন; প্রমথ তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তারপর তিনি হঠাৎ উঠিয়া গিয়া আর একজনের সংগে গল্প জুড়িয়া দিলেন। প্রমথ তখন ঘরের চারপাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই—অলক্ষিতে কখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অভাবনীয় ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু তবু প্রমথ একটু উৎকণ্ঠিত-ভাবেই ইতি-উতি চাহিতেছিল। প্রেমিকের চক্ষু নাকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়; আজ এখানে পদার্পণ করিয়াই প্রমথ অনুভব করিয়াছিল কোথায় যেন একটু খিচ্ আছে। তাহাকে দেখিয়া রূপলেখার চোখে আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আলোর পশ্চাতে অজ্ঞাত উদ্বেগের বাষ্প মেঘের আকারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে তাহাও যেন সে কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তারপর রূপলেখা হাসিয়াছে কথা কহিয়াছে, একবার চা দিবার ছলে ক্ষণেকের জন্য তাহার পাশে বসিয়াছে—কিন্তু তবু প্রমথর মনের কাঁটা দূর হয় নাই। তারপর দ্বিজনাথবাবুর বর্ষীয়সী আত্মীয়ার নিকট মুক্তি পাইয়া যখন সে দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই, তখন সে বাহিরে ধীরভাবে চা পান করিতে থাকিলেও মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

চায়ের বাটি শেষ করিয়া প্রমথ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া অনিশ্চিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় পাশের দরজা দিয়া রূপলেখা প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রমথ দেখিল ঘরের মৃদু আলোকেও তাহার মুখখানা ফ্যাকাসে বোধ হইতেছে, নিশ্বাস যেন একটু দ্রুত চলিতেছে; চোখে চাপা উত্তেজনা।

প্রমথ কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই রূপলেখা চমকিয়া তাহার পানে তাকাইল, তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া একটু ফিকা রকমের হাসিল।

প্রমথ বলিল, 'তোমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে—। বাগানে গিছলে বুঝি?'

—'হাঁ—ঘরে গরম হচ্ছিল—তাই—একটু বাগানে গিয়ে বসেছিলুম—' রূপলেখার নিশ্বাসের দ্রুততা তখনও শান্ত হয় নাই।

প্রমথ গলা খাটো করিয়া সাগ্রহে বলিল, 'চল না—তাহলে বাগানেই খানিক বসা যাক—'

—'বাগানে? না না—এখন থাক, এখন আর আমার গরম বোধ হচ্ছে না—'

গরম বোধ হইবার কথা নয়, কারণ সময়টা মাঘ মাস। এবং বাগানের অন্ধকারে বৃদ্ধ আর্দালি চৈত সিং চুপি চুপি কাগজের যে টুকরাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহাতে উত্তাপের সংস্পর্শ কতখানি ছিল অন্তর্যামীই জানেন; কিন্তু বুকের অত্যন্ত নিকটে লুক্কায়িত থাকিয়া কাগজের টুকরাটা রূপলেখার বুকে দুরু দুরু কম্পনই জাগাইয়া দিয়াছিল।

বুকের উপর একবার হাত রাখিয়া সে ভীতভাবে আবার হয়ত সরাইয়া লইল।

—'আমি—আমি এখুনি আসছি—'

প্রমথ দাঁড়াইয়া রহিল; রূপলেখা সহজতার একটা বাঁধা হাসি মুখে লইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়া অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

কিন্তু সহজতার অভিনয় করিলেও কৌতূহলীর দৃষ্টি এড়ানো সহজ নয়। ঘরের মধ্যেই কেহ কেহ রূপলেখার মানসিক অ-সহজতার আভাস পাইয়াছিল, এবং নিম্ন কণ্ঠে কিছু জল্পনাও চলিতেছিল।

ঘরের নির্জ্জন কোণে এক মিথুন বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। মহিলাটি দৃষ্টি দ্বারা রূপলেখার অনুসরণ করিয়া শেষে বলিলেন, 'আজ লেখার কী যেন হয়েছে—ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে।'

পুরুষটির অধর কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মহিলাটির

প্রতি একটি অর্দ্ধ নিমীলিত কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ও কিছু নয়। বিয়ের আগের রাত্রে মেয়েদের অমন হয়ে থাকে!'

মহিলাটি একটু মাথা নাড়িলেন।

—'না, ও সে জিনিষ নয়। কিছু একটা হয়েছে।'

রূপলেখা তখন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে। পুরুষটি ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, 'আজ আত্মীয় বন্ধু সকলেই এসেছেন দেখছি—শুধু—'

—'শুধু একজন নেই।'

—'চুপ্—দ্বিজনাথবাবু!'

গৃহস্বামী বাহির হইতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাথার হেল্‌মেট্ খুলিয়া ফেলিলেন। ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজনাথবাবু তুষারকঠিন কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার দেরী হয়ে গেল। কাজ ছিল। আসছি এখুনি—' বলিয়া টুপী মস্তকে স্থাপন করিয়া ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'রূপলেখা কোথায়?' তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজনাথবাবুর স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের মধ্যে বহু দীর্ঘনিশ্বাস পতনের সমবেত শব্দ হইল, যেন সকলে এতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া বসিয়াছিল।

* * * *

যে কন্যার বিবাহ আগামী কল্য, মধ্যরাত্রে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করা রুচিবিগর্হিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ

কন্যার মনের মধ্যে প্রবেশ করা একেবারেই ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কথায় বলে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং। তাহাদের মন লইয়া নাড়াচাড়া করা নিরাপদ নয়; কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িতে পারে। তাই আমরা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মত রূপলেখার বহিরাচরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইব, তাহার মনের ধার ঘেঁষিয়াও যাইব না।

গভীর রাত্রি। ঘর নিস্তব্ধ। সিঙার-মেজের উপর একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। বাহিরের দিকের জানালা ঈষৎ খোলা, কন্‌কনে বাতাস নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাতির শিখাটাকে মাঝে মাঝে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

সন্ধ্যা বেলার পোষাকী সাজ ছাড়িয়া রূপলেখা মামুলি শাড়ি শেমিজের উপর একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিজের বিছানায় পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। রাত্রি বারোটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে; পাশের ঘরে দ্বিজনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর কথাবার্ত্তার শব্দ আধঘণ্টা পূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রূপলেখার চোখে কিন্তু ঘুম নাই; ঈষৎ-খোলা জানালাটার দিকে অপলক চক্ষে চাহিয়া সে বসিয়া আছে।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল।

রূপলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল। মেঝে কার্পেট পাতা; তবু সে অতি সন্তর্পণে পা-টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ভেজানো দরজার ওপারে বাবা মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; রূপলেখা কান পাতিয়া শুনিল, ও ঘরে শব্দ মাত্র নাই। দ্বিজনাথবাবুর প্রচণ্ড দাপটে বাড়ীতে কাহারও নাক ডাকিত না।

ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখা সিঙার-মেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। মোম-বাতির পীতাভ শিখার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে

বুকের ভিতর হইতে সেই কাগজের টুকরা বাহির করিল। সেটা খুলিয়া মোমবাতির আলোয় পড়িতে পড়িতে তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল :

"এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কি মনে হ'ল ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। হঠাৎ চৈত সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ; বুড়োর কাছে শুনলুম কাল তোমার বিয়ে !! রাত্রে শোবার ঘরের জানলা খুলে রেখো। আমি আসব। তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে।"

চিঠিখানা পেন্সিলের আকারে পাকাইয়া রূপলেখা মোমবাতির শিখার কাছে লইয়া গেল ; কিন্তু আগুনে সমর্পন করিতে পারিল না—কি ভাবিয়া সেটাকে খুলিয়া ভাঁজ করিয়া আবার বুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। বুকের ভিতর হইতে একটি শিহরিত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

—"রূপু !"

অতি মৃদু ডাক কানে যাইতেই রূপলেখা চমকিয়া জানালার দিকে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল ; তারপর ছুটিয়া গিয়া জানালার কবাট খুলিয়া ধরিল।

অবলীলাক্রমে জানালা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যুবকটি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল তাহার বয়স বোধ করি বাইশ কি তেইশ! মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা টুইলের আধ-ময়লা কামিজ ; মুখে বেপরোয়া দুঃসাহসিক ধৃষ্টতার ভাব, চোখ দুটা জ্বল্‌জ্বলে এবং অত্যন্ত সতর্ক। ঘরে অবতীর্ণ হইয়াই সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর রূপলেখার দুই হাত নিজের দুই মুঠিতে ধরিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল। ব্যগ্র আনন্দে কথা কহিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইল।

তাহার দৃষ্টি সমস্ত ঘর ঘুরিয়া যখন রূপলেখার মুখের উপর ফিরিয়া

আসিল তখন রূপলেখার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে ; ঝাপসা অশ্রুর ভিতর দিয়া সে যুবকের মুখের পানে ক্ষুধিত চক্ষে চাহিয়া আছে।

নিঃশব্দ হাসিতে যুবকের মুখ ভরিয়া গেল। সে রূপলেখার হাত ছাড়িয়া দিয়া দু'হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'ও ঘরের খবর কি ?'

রূপলেখা যুবকের বুকের কামিজের উপর গাল ঘষিয়া গালের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল ; ভগ্নস্বরে চাপা গলায় বলিল, 'মা বাবা ঘুমিয়েছেন।'

যুবক তখন চিবুক ধরিয়া রূপলেখার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে যেন নিজ মনেই বলিল, 'রূপুরাণীর কাল বিয়ে। আশ্চর্য্য ! আমিও ঠিক এই সময়েই এসে পড়লুম !'

রুদ্ধস্বরে রূপু বলিল, 'আমি জানতুম—আজ সকালে ঘুম ভেঙে অবধি কেবল তোমার কথা—' তাহার গলা বুজিয়া গেল।

যুবক রূপলেখার হাত ধরিয়া খাটের দিকে লইয়া চলিল।

—'এস—বসি।'

দু'জনে পাশাপাশি পা ঝুলাইয়া বসিল। বিছানাটি নরম ও শুভ্র ; পায়ের কাছে লেপ পাট করা রহিয়াছে। যুবক আড়চোখে সেই দিকে একটা লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সবলে লোভ সম্বরণ করিয়া ফিরিয়া বসিল। বলিল, 'বেশীক্ষণ থাকতে পারব না—ক্ষণিকের অতিথি। সন্দেহ হয়, চৈত সিং ছাড়া আরও দু'একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। আজ রাত্রেই পালাতে হবে।'

ত্রাসে রূপলেখার চক্ষু ডাগর হইয়া উঠিল, যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, 'তবে ? কি হবে ? যদি ধরা পড়—?'

রূপলেখার ভয় দেখিয়া যুবক নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, শেষে

বলিল, 'যদি ধরে ফ্যালে, ঝুলিয়ে দিতে বেশী দেরি করবে না। পুলিশ সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে।'

যুবকের ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া রূপলেখা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, 'চুপ্ কর, চুপ্ কর—বোলো না—'

—'আচ্ছা, ও কথা থাক।'

যুবক একটু চুপ করিল, ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দরজার পানে তাকাইল; পাশের ঘরে নিদ্রিত থাকিয়াও দ্বিজনাথবাবু ইহাদের উপর অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার অদূর-স্থিতি ইহারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছে না।

যুবক রূপলেখার আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'ভাবী বরের নাম শুনলুম প্রমথ। পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। লোকটি কেমন?'

রূপু ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যুবকের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল; সে আবার প্রশ্ন করিল, 'দেখতে কেমন? শুনিই না। আমার চেয়ে দেখতে ভাল নিশ্চয়ই?'

রূপু পলকের জন্য যুবকের মুখের পানে চোখ তুলিয়া আবার চোখ নত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ক্ষীণালোক ঘরে দু'জনে পাশাপাশি শয্যার উপর বসিয়া আছে। যুবক রূপলেখার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্যে বলিল, 'গায়ে একটু মাংস লেগেছে দেখছি। —বিয়ের জল?'

পরিহাসে কান না দিয়া রূপলেখা মর্ম্মপীড়িত চোখ তুলিয়া বলিল, 'কিন্তু তুমি যে—তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ।—কেন? কেন?'

যুবক শুধু একটু হাসিল। রূপলেখা বলিতে লাগিল, 'এই শীতে—মাগো—ঠাণ্ডা মাথা—' বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক কামিজ তুলিয়া দেখাইল ভিতরে একটা সস্তা জাপানী সোয়েটার আছে।

মাথা নাড়িয়া রূপলেখা বলিল, 'তা হোক, ওতে কি শীত ভাঙে!'

যুবক রূপলেখার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'রূপু, বুকের রক্ত যার গরম তার গরম জামা দরকার হয় না। কিন্তু এবার যেতে হবে। বিয়েটা দেখবার বড় সাধ হচ্ছিল, তা আর হ'ল না।'

খামখেয়ালী হাসিয়া যুবক উঠিবার উপক্রম করিল।

রূপলেখা তাহার হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না, ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলিল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

আঙুল হইতে আংটি খুলিতে খুলিতে রূপলেখা বলিল, 'এটা নাও। যদি কখনো দরকার হয়—বিক্রি করলে—'

যুবকের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'রূপু, এ বাড়ির একটা কুটো আমি ছোঁব না।'

কাঁদিতে কাঁদিতে, আংটিটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে দিতে রূপলেখা বলিল, 'এ বাড়ির নয়; এ আমার। উনি আমাকে দিয়েছেন—'

যুবক সচকিতে আংটিটার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া যেন পরম বিস্ময়ে সেটার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর রূপলেখার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, দুর্নিবার অট্টহাসির ধমকে সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

দীর্ঘকাল পরে হাসি থামিলে যুবক সংযত ভাবে বলিল, 'আচ্ছা, নিলুম।' বলিয়া ক'ড়ে আঙুলে আংটি পরিধান করিল।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল। একটা—না দেড়টা?

যুবক নিতান্ত সহজভাবে বলিল, 'চললুম। আবার কবে কোথায় দেখা হবে জানি না। হয় ত—' কথা শেষ না করিয়া যুবক থামিয়া গেল, তারপর একটু হাসিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

জানালার সম্মুখে পৌঁছিয়া কবাট খুলিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে রূপলেখার সংহত কণ্ঠস্বর আসিল।

—'যাচ্ছ ?'

যুবক আবার ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণকালের জন্য একটা ব্যথার ভাব তাহার মুখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

—'হ্যাঁ—চললুম। আড়াইটার সময় একটা ট্রেন আছে, সেইটে ধরব!'

তারপর গভীর স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কপালে একটি চুম্বন করিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, 'সুখী হও—চিরায়ুষ্মতী হও।'

জানালা ডিঙাইয়া যুবক নিঃশব্দে বাহিরের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। মোম বাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল: খোলা জানালা পথে শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার শিখাটাকে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল।

রূপলেখা বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। রোদনের অদম্য উচ্ছ্বাস শাসন মানিতে চায় না কিন্তু জোরে কাঁদিয়া মনের ব্যাকুলতাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় নাই ; পাশের ঘরে দ্বিজনাথবাবু ঘুমাইতেছেন। রূপলেখা সজোরে বালিস কামড়াইয়া ধরিয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে বার বার বলিতে লাগিল, 'দাদা! দাদা—!'

রোমান্স

ছোটনাগপুরের যে অখ্যাতনামা স্টেশনে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম তাহার নাম বলিব না। পেশাদার হাওয়া-বদলকারীরা স্থানটির সন্ধান পায় নাই; এখনও সেখানে টাকায় ষোল সের দুধ এবং দুই আনায় একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী পাওয়া যায়।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'দোসর জন নহি সঙ্গ'। দিনান্তে মন খুলিয়া দুটা কথা বলিব এমন লোক নাই। পোস্টমাস্টারবাবু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং মেজাজ অত্যন্ত কড়া। তা ছাড়া স্টেশনের মালবাবুটি আছেন বাঙালী; কিন্তু তিনি রেলের মাল ও বোতলের মালের মধ্যে নিজেকে এমন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন যে সামাজিক মনুষ্যহিসাবে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই।

দুগ্ধ ও কুক্কুটমাংসের সুলভতা সত্ত্বেও বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। দিন এবং রাত্রি কোন মতে কাটিয়া যাইত; কিন্তু বৈকাল বেলাটা সত্যই অচল হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে বানপ্রস্থ অবলম্বনের যে বিধি ঠাকুর-কবি দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমার আপত্তি নাই, নচেৎ প্রস্তাবটা পুরামাত্রায় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। যৌবনকালে অবিবাহিত অবস্থায় একাকী হাওয়া বদলাইতে আসিয়া ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু দু-চার দিন কাটিবার পর সন্ধ্যা যাপন করিবার একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। রেলের স্টেশনটি নিরিবিলি; লম্বা নীচু প্ল্যাটফর্ম এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত চলিয়া গিয়াছে—উপরে কোনও প্রকার ছাউনি নাই। মাঝে মাঝে একটি করিয়া বেঞ্চ

পাতা আছে। এক দিন বৈকালে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াই একটা বেঞ্চির উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম। মিনিট কয়েক পরে স্টেশনে সামান্য একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল ; তার পরই হু হু শব্দে পশ্চিম হইতে কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া পড়িল। যাত্রীর নামা-ওঠার উত্তেজনা নাই বলিলেই চলে ; কিন্তু সারা গাড়ীটা যেন মনুষ্যজাতির বিচিত্র সমাবেশে গুলজার হইয়া আছে। জানালা দিয়া কত প্রকারের স্ত্রী-পুরুষ গলা বাড়াইয়া আছে, কলরব করিতেছে। ফার্স্ট ক্লাসে দু-চারিটি ইংগ-সাহেব-মেম নিজেদের চারি পাশে স্বতন্ত্রতার দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। ঘর্ম্মাক্তকলেবর অর্দ্ধ-উলঙ্গ এঞ্জিন-ড্রাইভারটা যেন এক পক্কড় কুস্তি লড়িয়া ক্ষণেকের জন্য মল্লভূমির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, আমার চোখের সামনে লোহার খাঁচায় পোরা একটা ধাবমান মিছিল আসিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট দাঁড়াইয়া ট্রেন-দৈত্য আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এখানে তাহার কোনই কাজ ছিল না, শুধু হাঁফ লইবার জন্য একবার দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে একটা নেশা ধরাইয়া দিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্য্যোগের মত হঠাৎ আসিয়া হাজির হওয়া, তার পর তেমনই আকস্মিক ভাবে উধাও হইয়া যাওয়া—ইহার মধ্যে যেন একটা রোমান্স রহিয়াছে। জীবনের গতানুগতিক ধারার মধ্যে এমনি বৈচিত্র্য আসিয়া প্রাণকে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দেয়—ইহাই ত রোমান্স!

স্টেশন আবার খালি হইয়া গিয়াছিল। বেশ একটু প্রফুল্লতা লইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, ঠং ঠং করিয়া স্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সচকিতে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে ট্রেন আসিতেছে। আবার বসিয়া পড়িলাম।

ইনিও মেল ; কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতেছেন। তেমনই বিচিত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। জানালার প্রতি ফ্রেমে চলচ্চিত্রের এক-একটি দৃশ্য। তার পর সেই খাঁচায়-পোরা দীর্ঘ মিছিল লোহা-লক্কড় বাষ্প ও কয়লার জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম আজ আর কোন ট্রেন আসিবে না। শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিলাম।

পরদিন বৈকালে আবার গেলাম। ক্রমে এটা একটা দৈনন্দিন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এমন হইল যে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দিকে সরিতে আরম্ভ করিলেই আমার পদযুগলও অনিবার্য্য টানে স্টেশনের দিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। আধ ঘণ্টা সেখানে বসিয়া দুটি ট্রেনের যাতায়াত দেখিয়া তৃপ্তমনে ফিরিয়া আসি। কোনও ট্রেন কোনও দিন একটু বিলম্বে আসিলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি। নিজেরই উৎকণ্ঠায় নিজেরই হাসি পায়, তবু উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারি না ; যেন ইহাদের যথাসময়ে আসা না-আসার দায়িত্ব কতকটা আমারই স্কন্ধে।

সেদিনের কথাটা খুব ভাল মনে আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি ; ঝির-ঝিরে বাতাস স্টেশনের ধারের ছোট ছোট পলাশগাছের পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে কয়েক খণ্ড হাল্কা মেঘ অস্তমান সূর্য্য হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেছিল, বাতাসের রং গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। কনে-দেখানো আলো, এ আলোর নাকি এমন ইন্দ্রজাল আছে যে চলনসই মেয়েকেও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনে গিয়া বসিয়াছি, মনে এই কনে-দেখানো গোলাপী আলোর ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর যে-কামরাটা ঠিক আমার সম্মুখে

আসিয়া থামিয়াছিল, তাহারই একটা জানালা আমার চোখের দৃষ্টিকে চুম্বকের মত টানিয়া লইল।

জানালার ফ্রেমে একটি মেয়ের মুখ। কনে-দেখানো আলো সেই মুখখানির উপর পড়িয়াছে বটে, কিন্তু না-পড়িলেও ক্ষতি ছিল না; এত মিষ্টি মুখ আর কখনও দেখি নাই। চুলগুলি অযত্নে জড়ান, চোখদুটি স্বপ্ন দেখিতেছে। আমার উপর তার চক্ষু পড়িল, তবু সে আমাকে দেখিতে পাইল না। বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; যৌবনের অভিনব স্বপ্নরাজ্যে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ঘোর চোখে লাগিয়া আছে। মনের বনচারিণী। অন্তরের কৌমার্য্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; শিলারুদ্ধপথ তটিনীর মত পথ খুঁজিতেছে কিন্তু শিলা ভাঙিয়া ফেলিবার সাহস এখনও হয় নাই। যৌবনের তটে দাঁড়াইয়া তাহার পা দুটি ন যযৌ ন তস্থৌ।

গাড়ীর কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ নাই। এক মিনিট কখন কাটিয়া গেল; গাড়ী গোলাপী বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমার দৃষ্টির চুম্বক দিয়া লোহার গাড়ীটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। গাড়ী কিন্তু থামিল না।

তার পর কতক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম। পশ্চিমগামী গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল জানিতেও পারিলাম না। চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্কা বাতাস তখনও পলাশ-পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে কিন্তু আকাশের কনে-দেখানো আলো আর নাই, কখন মিলাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়; এত সুকুমার মুখ বাঙালীর মেয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু পশ্চিম হইতে আসিতেছে। তা পশ্চিমে তো কত বাঙালী বাস করে। কোথায়

যাইতেছে ? হয় তো কলিকাতায়। কিন্তু আগেও নামিয়া যাইতে পারে। কোথায় ? বর্দ্ধমান ? চন্দননগর ? বাংলা দেশটা তো এতটুকু নয়। এই বিপুল জনসমুদ্রে এক বিন্দু শিশিরের মত সে কোথায় মিলাইয়া যাইবে !

কুতূহলী জল্পনা চলিতে লাগিল। মন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। আবার কখনও দেখা হইবে কি ? ইংরেজি বচন মনে পড়িল—Ships that pass in the night। না, তা হইতেই পারে না। একবার মাত্র চোখের দেখায় যে মনের উপর এমন দাগ কাটিয়া দিল, সে চিরজীবনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে ! আর তাহাকে কখনও দেখিতে পাইব না !

আশ্চর্য ! এমন তো কত লোককেই প্রত্যহ দেখিতেছি, কাহারও পানে ফিরিয়া তাকাইবার ইচ্ছাও হয় না—আয়নার প্রতিবিম্বের মত চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে মনে আড়াল হইয়া যায়। অথচ এই মেয়েটি এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল কি করিয়া ?

সে কুমারী—আমার মন বুঝিয়াছে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিন্দুর, মাথায় আঁচল ছিল না। ঠোঁট দুটিও অনাঘ্রাত কচি কিশলয়ের মত—

তবে ? কে বলিতে পারে ? জগতে এমন কত বিচিত্র ব্যাপারই তো ঘটিতেছে। হয়ত আমারই জন্য সে—

মন তাহাকে লইয়া মাধুর্য্যের হোলিখেলায় মত্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন অভ্যাসমত আবার স্টেশনে গেলাম। দুটা গাড়ীই পর-পর বিপরীত মুখে চলিয়া গেল ; আজ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্যই করিলাম না। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী ; বহির্জগৎ যেন ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মাথার ভিতর দিয়া তড়িৎ খেলিয়া গেল। কে বলিতে পারে,

হয়ত এই পথেই সে ফিরিয়া যাইবে। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না, কোথায় গিয়াছে তাহাও অজ্ঞাত ; তবু এই পথেই ফিরতে পারে ত !

পরদিন হইতে আবার সতর্কতা ফিরিয়া আসিল। শুধু তাই নয়, এত দিন যাহা ছিল নির্ব্যক্তিক কৌতূহল তাহাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমযাত্রী গাড়ী আসিলে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না ; সময় অল্প, তবু সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঘুরিয়া সব জানালাগুলা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। হঠাৎ জানালায় কোনও মেয়ের মুখ দেখিয়া বুক ধড়াস করিয়া উঠে। তার পরই বুঝিতে পারি এ সে নয়।

মাঝে মাঝে মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কই ফিরিল না ত! তবে কি অন্য পথে ফিরিয়া গিয়াছে? কিংবা—যদি না ফেরে? হয়ত চিরদিনের জন্য বাংলা দেশে থাকিয়া যাইবে। এমনও ত হইতে পারে, পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিবার পথে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তবে, আমি যে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ট্রেন সন্ধান করিতেছি, ইহা ত নিছক পাগলামি।

আবার কখনও কখনও মনের ভিতর হইতে একটা দৃঢ় প্রত্যয় উঠিয়া আসে। দেখা হইবেই। তাহাকে মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইয়াছি যে সে আমার মনের ঘরণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আর চোখে দেখিতে পাইব না, এ হইতেই পারে না।

কল্পনা করি, দেখা হইলে কি করিব। গাড়ীতে উঠিয়া বসিব? কিংবা, এই বেঞ্চিতে বসিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিব। সে একটি কথা বলিবে না, গাড়ী হইতে নামিয়া আমার সামনে স্মিতমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। দু-জন হাতধরাধরি করিয়া স্টেশনের বাহির হইয়া যাইব ;

পাথুরে কাঁকর-ঢালা পথ দিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে এক সময় জিজ্ঞাস করিব,—এত দেরি করলে কেন ?

কিন্তু তাহার দেখা নাই।

তার পর এক দিন—

সে-দিনের কথাও বেশ ভাল মনে আছে।

পশ্চিমগামী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। বেঞ্চি হইতে উঠিতে হইল না, ঠিক সামনের জানালায়। বারো দিন পরে আবার ফিরিয়া চলিয়াছে।

লাল চেলিতে তাহার সর্ব্বাংগ ঢাকা, সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিন্দুর লেপিয়া গিয়াছে। চোখের চাহনি তেমনই স্বপ্নাতুর। আমার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু এবারও সে আমাকে দেখিতে পাইল না। মনের বনচারিণী। কিন্তু তবু আজ কোথায় একটা মস্ত তফাৎ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আকাশের কনে-দেখানো আলো যে বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহা তাহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এক মিনিট। গাড়ী চলিয়া গেল। তার পর কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম। নিজের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্কা বাতাস পলাশপাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।